বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম।

(পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও পুনর্লিখিত)

"Life is short but Art is long."

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ

প্রকাশক—শ্রীআশুতোষ বসু,

মজিলপুর—২৪ পরগণা।

পৌষ, ১৩১৭।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

স্বর্গীয় অনাথনাথ মল্লিক

রায় বাহাদুরের

প্রীতি-কামনায়

এই গ্রন্থ

উৎসৃষ্ট হইল।

ভূমিকা।

বহু যত্নে ও বিপুল পরিশ্রমে, "বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমের" দ্বিতীয় সংস্করণ হইল। এই সংস্করণে গ্রন্থখানি আমূল পরিবর্ত্তিত এবং বহুস্থান পুনর্লিখিত হইয়াছে। এবার একটু অভিনব পন্থায়, বঙ্কিমের জীবনের সহিত তদীয় অপূর্ব্ব কাব্যাবলীর সাদৃশ্য বুঝিতে চেষ্টা পাইয়াছি। অবশ্য সহৃদয় পাঠক তাহার বিচার করিবেন।

বর্ত্তমান সংস্করণে বঙ্কিমকে সকল দিক্ হইতে একটু আধটু বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহাতে মূল প্রসঙ্গের সহিত অনেক অবান্তর কথাও আসিয়া পড়িয়াছে। আসা অনিবার্য্য বলিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং অনেক স্থলে যে, অনেকের সহিত মতান্তর হইবে, তাহা বুঝিতেছি। পরন্তু এই মতান্তর উপলক্ষে, কাহারও সহিত মনান্তর না ঘটিলে, সৌভাগ্যবোধ করিব। কারণ, দিন-কাল এখন বড় সুবিধার নয়।

বর্ত্তমান তৃতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে নূতন কথা কিছু নাই। দুই এক স্থান একটু আধটু মার্জ্জিত করিয়া দিয়াছি মাত্র।

মজিলপুর, ২৪ পরগণা। — সেবক শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

বঙ্কিম-জীবনী।
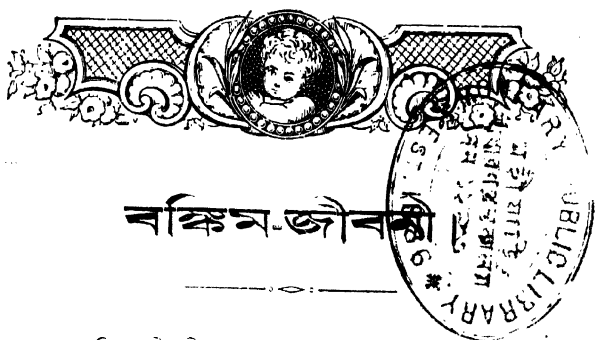
কবির জীবনী লেখা বড় শক্ত কাজ। কারণ কবির জীবন, সাধারণ মানব-জীবন হইতে কিছু স্বতন্ত্র। তুমি আমি যেটাকে খুব একটা গুরুতর বিষয় বলিয়া বিবেচনা করি, কবি হয়ত সেটাকে অতি সামান্য বা নগণ্য মনে করেন। আবার তোমায় আমায় যে জিনিসটাকে অতি তুচ্ছ বলিয়া উপেক্ষা করি, কবি হয়ত সেই জিনিসটাকেই হৃদয়ের অতি প্রিয়বস্তু বলিয়া মনে করেন। তোমার আমার সম্বল বহির্জগৎ,—বাহিরের খুটী-নাটী লইয়াই তোমায় আমায় দিন অতিবাহিত করি;—কিন্তু কবির লক্ষ্য অন্তর্জগৎ,—সেই জগতেই তিনি মগ্ন;—কাজেই সাধারণ মানুষের সহিত তাঁহার ঠিক থাপ্ খায় না। তাই বলিতেছিলাম, কবির জীবনী লেখা বড় শক্ত কাজ।

প্রকৃত যাহা হৃদয়ের ইতিহাস, তাহাকেই আমি জীবনী বলি। মূল প্রবন্ধে, আমাদের বঙ্কিমের সেই হৃদয়ের ইতিহাস বুঝিতে চেষ্টা পাইয়াছি। যদি সে চেষ্টা সফল হইয়া থাকে, তবে চিন্তাশীল পাঠক সেই মূল প্রবন্ধেই বঙ্কিমের জীবনী

দেখিতে পাইবেন। তবে "বঙ্কিম-জীবনী" ভূমিকা ফাঁদিয়া, এখন যাহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা জীবনী নহে,—জীবনী-লেখকের "কাহিনী" মাত্র। অর্থাৎ বঙ্কিমের বংশাবলীর কিছু পরিচয়, বৈষয়িক কাজ কর্ম্মের কথা, পারিবারিক প্রসঙ্গ,—ইত্যাদি ইত্যাদি। তবুও এরূপ "কাহিনী"র একটু প্রয়োজন আছে। অনেক সময়, গৃহ দেখিয়া, "গৃহস্থ" কেমন, বুঝা যায়। বঙ্কিমকে বুঝিতে হইলে 'বঙ্কিমের গৃহ'ও একটু বুঝা ভাল। পাঠকের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য তাই অতি সংক্ষেপে আমরা বঙ্কিমের সেই 'গৃহটির' একটু পরিচয় দিব।

গৃহ-সুখ বঙ্কিমের যথেষ্টই ছিল। ধর্ম্মশীল কৃতী পিতা; স্নেহময়ী সরলপ্রাণা মাতা; সদাশয় আনন্দময় ভ্রাতা; সতী-লক্ষ্মী সহধর্ম্মিণী; সুখময় স্বাস্থ্য,—সংসারী লোকের যাহা প্রার্থনীয়, কবির ভাগ্যে সকল গুলিই প্রচুর পরিমাণে মিলিয়াছিল। বঙ্কিমের পিতৃদেব,—রায় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর—সমাজের একজন গণ্য মান্য পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন। উপার্জ্জন তাঁহার উত্তমরূপই ছিল। সুতরাং সাংসারিক অসচ্ছলতা ইঁহাদের কখন হয় নাই। তার পর বঙ্কিম বাবুরা কয় ভায়ে মানুষ হইয়া, কয়জনেই রাজকীয় উচ্চ কর্ম্ম পাইলেন;—কয় জনেই ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইলেন। কয় ভাইয়ের পরস্পরের মনের মিল যথেষ্ট ছিল। সুতরাং সাংসারিক সুখের অসদ্ভাব হইবে কেন? বাড়ীতে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া, অতিথি অভ্যাগতের সেবা, লোকজন খাওয়ান,—এ সকল কার্য্যে স্বভাবতই মন সরস ও প্রফুল্ল থাকে। তার উপর ইহাঁরা কয় ভাইয়ে এমন মেশা-

মেশি হইয়া থাকিতেন,—এমন মাখামাখি করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন যে, ইয়ারে-ইয়ারেও তত খোলাখুলি আমোদ-আহ্লাদ করিতে জানে না। ইহাঁরা বুঝিতেন, বাহিরে—অধিক দূরের লোকের সহিত আমোদ আহ্লাদ করিতে যাওয়ায় অনেক বিড়ম্বনা আছে। *

বাহিরের এই সদানন্দ দিব্যভাব, আবার অন্দরে বধূদিগের মধ্যেও ততোধিক। সুতরাং বলিতে হয়, যাদবচন্দ্রের সংসার বড় পুণ্যের সংসার ছিল। এই পুণ্যের সংসারেই প্রতিভাবান্ কবির প্রতিভা-কিরণ ফুটিতে থাকে।

"সঞ্জীবনী-সুধা" নামক গ্রন্থে, ৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী হইতে, আমাদের বঙ্কিমের পূর্ব্ব পুরুষদিগের কিছু পরিচয় পাই। স্বয়ং বঙ্কিমই সে জীবনী-লেখক। অগ্রজের সেই জীবনীতে তিনি লিখিতেছেন,—

"অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণীর ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্ব্ব-পুরুষ। তাঁহার বাস ছিল—হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রামনিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় প্রাপ্ত হইয়া, কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই অবধি রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছেন। এই ক্ষুদ্র লেখকই কেবল

* বঙ্কিম বাবু প্রিয়তম দৌহিত্রগণের সহিতও বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতেন। বলিতেন, ইহাদের সঙ্গে এরূপভাবে মেশামেশি না করিলে, ইহারা অন্যত্র বন্ধু অন্বেষণে বাধ্য হইবে; তাহাতে আশঙ্কা আছে।

স্থানান্তর বাসী। † * * * তিনি (সঞ্জীবচন্দ্র) কথিত রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র; পরমারাধ্য ৺যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র।"

এই যাদবচন্দ্র, একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন কর্ম্মী ও কৃতিপুরুষ ছিলেন। তাঁহার দেহ যেমন বলিষ্ঠ, মনও তেমনই উৎসাহোদ্দীপ্ত ও উন্নত ছিল। তাঁহার ধর্ম্ম ও গুরুবল এবং ঈশ্বর-নির্ভরের কিছু বিচিত্র রকমের কথা শুনা যায়। ইহার সহিত প্রবল পুরুষকার মিশিয়া,—প্রকৃতই যাদবচন্দ্রকে একজন তেজস্বী পুরুষসিংহ করিয়া তুলিয়াছিল।

এই যাদবচন্দ্রের চারিপুত্র,—শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। যাদবচন্দ্র লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালে ডেপুটী কলেক্টার নিযুক্ত হন। কর্ম্মোপলক্ষে চিরকালই তিনি বিদেশে থাকিতেন। এজন্য পুত্রগণকেও মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত এ-দেশ সে-দেশ করিয়া বেড়াইতে হইত। তাহাতে বালকদিগের লেখাপড়ার কিছু ক্ষতি হইত।

সন ১২৪৫ সালের ১৩ই আষাঢ়, ইংরেজী ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৭-এ জুন, ২৪ পরগণার অন্তর্গত কাঁটালপাড়া নামক গ্রামে বঙ্কিমের জন্ম হয়।

এই কাঁটালপাড়া,—পূর্ব্ববঙ্গ রেলের নৈহাটী ষ্টেশনের নিকট। ইহার পশ্চিমপার্শ্বে ভাগীরথী। এই ভাগীরথীর উভয়-

---

† এই জীবনী প্রণয়নকালে বঙ্কিম বাবু কলিকাতাবাসী হইয়াছিলেন;—৫ নং প্রতাপ চাটুর্য্যের লেন পটলডাঙ্গায় তিনি একটি বাটী খরিদ করিয়া বাস করিতেছিলেন।

পার্শ্বস্থ গ্রামগুলিতে দুই একটি শক্তিসম্পন্ন পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্কিম তাঁহাদের অন্যতম।

শিশুকালে বঙ্কিম পিতার নিকটেই ছিলেন। তখন তাঁহার পিতা মেদিনীপুরের ডেপুটী-কলেক্টার। সঞ্জীবের জীবনীতে বঙ্কিম নিজেই লিখিতেছেন,—

"কিছুকালের পর আবার আমাদিগকে কাঁটালপাড়ায় আসিতে হইল। * * * আবার একজন "গুরুমহাশয়" নিযুক্ত হইলেন। আমার ভাগ্যোদয় ক্রমেই এই মহাশয়ের শুভাগমন; কেন না আমাকে 'ক খ' শিখিতে হইবে, কিন্তু বিপদ অনেক সময়েই সংক্রামক। সঞ্জীবচন্দ্রও রামপ্রাণ সরকারের হস্তে সমর্পিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আট দশ মাসে এই মহাত্মার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মেদিনীপুর গেলাম।"

এই শৈশবেই মেধাবী বঙ্কিমের প্রতিভার পরিচয় পাই। 'হাতেখড়ির' দিন, এই গুরুমহাশয়ের নিকট, এক দিনেই তিনি সমস্ত 'বর্ণমালা' শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স অবশ্য, পাঁচ বৎসর মাত্র। গুরুমহাশয় বঙ্কিমের এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিশিষ্ট স্মরণশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতেন।

১২৫২ সালে ৭ বৎসর বয়সে, বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী স্কুলে নিযুক্ত হন। পিতা যাদবচন্দ্র তখন মেদিনীপুরে;—সুতরাং এই মেদিনীপুর ইংরেজী স্কুলেই বঙ্কিমের ইংরেজী শিক্ষার আরম্ভ। এখানেও বুদ্ধিমান্ বঙ্কিম নিজগুণে শিক্ষকগণকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। প্রতিবর্ষেই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া একেবারে দুই শ্রেণী অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

পাছে গুরু-পরিশ্রমে বালক বঙ্কিমের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় শিক্ষকগণ তাঁহার 'ডবল প্রমোশন' বন্ধ করিয়া দিলেন।

১২৫৭ সালে যাদবচন্দ্র মেদিনীপুর হইতে ২৪ পরগণায় বদলী হইলেন! তখন বঙ্কিমের বয়স ১১।১২ বৎসর। এই ১১।১২ বৎসর বয়সে বঙ্কিম সুবিখ্যাত হুগলী কলেজে নিযুক্ত হন, এবং কালে উক্ত কলেজের মুখোজ্জ্বল করেন। ক্লাসের নির্দ্দিষ্ট পুস্তকাবলী পাঠে তাঁহার জ্ঞানতৃষা মিটিত না। কাজেই, নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক পাঠ যত হউক না হউক, বঙ্কিম শিক্ষকদিগের অগোচরে, লুকাইয়া কলেজের লাইব্রেরী হইতে নানা শ্রেণীর নানা গ্রন্থ পাঠ করিতেন। অথচ পরীক্ষার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে এরূপ ভাবে স্কুলপাঠ্য পুস্তকে মনোনিবেশ করিতেন যে, বৎসরান্তে পরীক্ষার সময়, তিনি সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া নির্দ্দিষ্ট পুরস্কার বা বৃত্তি পাইতেন। যথা সময়ে তিনি "সিনিয়র স্কলারসিপ" পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন। এক স্বর্গীয় জজ দ্বারকানাথ মিত্র ব্যতীত বঙ্কিমের ন্যায় প্রতিভাশালী ছাত্র বোধ হয় এ অবধি আর হুগলী কলেজে দৃষ্ট হয় নাই।—সকল অবস্থাতেই বঙ্কিম সকলের এক সোপান উচ্চে অবস্থিত।

এই হুগলী কলেজে পাঠের সময় সংস্কৃত পড়িতে বঙ্কিমের একান্ত অভিলাষ হয়। বঙ্কিম প্রতিদিন কলেজ হইতে বাটী আসিয়া টোলে সংস্কৃত পাঠ করিতে লাগিলেন। এক বৎসরের মধ্যে মোটামুটী সংস্কৃত শিখিলেন। তার পর তিন চারি বৎসর যাবৎ বহু সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া সংস্কৃতে একরূপ অভিজ্ঞতা-লাভ করিলেন।

একাদশ বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্র বিবাহিত হন। কিন্তু বিবাহের ৮।৯ বৎসর পরে তিনি বিপত্নীক হইলেন। ১৯।২০ বৎসর বয়সে বঙ্কিম দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন—সে অশেষগুণে গুণবতী সতী-সাধ্বী সহধর্ম্মিণী আজি পতিশোকে কাতরা। রাজ-রাজেশ্বর অপেক্ষাও কীর্ত্তিমান্ পতি-দেবকে হারাইয়া, দেবী রাজলক্ষ্মী আজ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতপরায়ণা। সম্প্রতি আবার হায়! পুত্রপ্রতিম স্নেহাস্পদ জ্যেষ্ঠ-জামাতা,—"প্রচার"-প্রচারক রাখালচন্দ্রকে হারাইয়া তিনি শোকাচ্ছন্না। কন্যার বৈধব্য-যন্ত্রণা তাঁহাকে চোখে দেখিতে হইতেছে!—তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই।

হুগলী কলেজে পাঠের সময় বঙ্কিম সুবিখ্যাত "সংবাদ প্রভাকর" ও "সাধুরঞ্জন" নামক সংবাদপত্রে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। এই দুই পত্রে নাটককার দীনবন্ধু মিত্র ও কৃষ্ণনগর কলেজের তদানীন্তন উৎকৃষ্ট ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারী—কবিতা লিখিতেন। সুতরাং কাব্য-যুদ্ধে জয়ী হইবার অভিলাষে, পাঠ্যাবস্থাতেই বঙ্কিম সাহিত্যের আসরে নামিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁহাকে দুই একবার পরাজিত হইতে হইয়াছিল। তথাপি সেই সময় হইতেই তাঁহার লেখায় একটু মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। দীনবন্ধু বা দ্বারকানাথের লেখায় সে গুণ ছিল না;—তাঁহারা গুরুর অনুকরণ করিতেন মাত্র। ইহাঁদের তিন জনেরই গুরু—সেই দেশবিখ্যাত গুপ্ত-কবি ৺ঈশ্বরচন্দ্র।

সাহিত্যে যেরূপ, গণিতশাস্ত্রেও বঙ্কিমের সেইরূপ অসাধারণ অধিকার ছিল। কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্রের অধ্যয়ন কালে, কলেজের

অধ্যাপক একদিন ছাত্রদিগকে জ্যামিতির একটা কঠিন 'প্রতিজ্ঞা' পূরণ করিতে দেন। ক্লাসের কোন ছাত্র সে প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে সমর্থ হয় নাই;—অধ্যাপক দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "বঙ্কিম থাকিলে আজ আর আমায় এ প্রতিজ্ঞাটি তোমাদিগকে শিখাইতে হইত না।"

হুগলী কলেজের পাঠ সাঙ্গ হইলে, ১২৬২ সালে, আইন অধ্যয়নের জন্য, বঙ্কিম কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে নিযুক্ত হন। কিছুদিন আইন পাঠও করিলেন। কিন্তু এই সময়,—১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বি-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। বঙ্কিম আইন ফেলিয়া বি-এ পরীক্ষায় প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তখন পরীক্ষার দুইমাস মাত্র সময় আছে। সেই দুইমাস মাত্র পাঠ করিয়া, প্রতিভাবান্ বঙ্কিম যথাকালে প্রশংসার সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি ও কলিকাতা গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন-নিবাসী ৺যদুনাথ বসু,—বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বি-এ। বঙ্কিমের বয়স তখন কুড়ি।

হালিডে সাহেব এই সময় বঙ্গের ছোটলাট। তিনি বঙ্কিমের মনস্বিতায় মুগ্ধ হইয়া, গুণের পুরস্কার স্বরূপ বঙ্কিমকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ দিলেন। তখন এই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ বিশেষ সম্মানের পদ ছিল। কুড়ি বৎসর বয়সে ডেপুটী বঙ্কিম যশোহরে নিযুক্ত হইলেন। এইখানেই নাটককার দীনবন্ধু মিত্রের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। সুরসিক দীনবন্ধুর সহিত সুরসিক বঙ্কিমের আলাপ,—মণি-কাঞ্চন যোগ হইল। অল্পদিন মধ্যেই উভয়ের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা,

প্রণয় ও সদ্ভাব সংস্থাপিত হইল। এই দীনবন্ধু ও তদানীন্তন পুলিশের উচ্চ-কর্ম্মচারী জগদীশনাথ রায় বঙ্কিমের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আরও অনেকে ছিলেন। নানা কারণে সে সময়কার যুবা বয়সের পানদোষ ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক দোষের হস্ত হইতে বঙ্কিম অব্যাহতি পান নাই। অবশ্য বয়সে সে দোষ শোধ-রাইয়াছিল। বয়সে তিনি শুদ্ধাচারে পবিত্রভাবে থাকিতেন।—এমন কি, কিছুদিনের জন্য হবিষ্যান্নও গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যশোহরে ছয় সাত মাসের মধ্যেই ডেপুটী বঙ্কিম আপন বিচার-ক্ষমতা দেখাইলেন। এই যশোহর বাসের সময়েই তাঁহার প্রথমা পত্নীর লোকান্তর হয়। সাত মাস যশোহরে থাকিয়া বঙ্কিম কাঁথিতে বদলী হইলেন। এই সময়েই তিনি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন। কাঁথিতে এক বৎসর থাকিয়া খুলনায় বদলী হন। এই সময় খুলনা অঞ্চলে নীলকর 'বিষধরগণের' বিশেষ উপদ্রব ছিল। মরেলগঞ্জের মরেল ও দুর্দ্দান্ত হিলি সাহেব বঙ্কিমের ভয়ে খুলনা ত্যাগ করিয়া আসাম পলাইল। বঙ্কিমের স্বাক্ষরিত ওয়ারেণ্ট সঙ্গে সঙ্গে সেই আসামেও ছুটিল; আসামীগণ ধৃত হইল। যথাসময়ে সদলবল নীলকরগণকে তিনি রীতিমত শিক্ষা দেন। সেই হইতেই পূর্ব্বাঞ্চলে নীলকর উপদ্রব অনেকটা প্রশমিত হয়।

ইহা ব্যতীত এই পূর্ব্বাঞ্চলে বঙ্কিমের আর একটি কীর্ত্তি আছে। খুলনার সুন্দরবনের জল-পথে বড় দস্যুভয় ছিল। প্রায়ই নৌকা লুট হইত। বঙ্কিমের শাসনগুণে সেই দস্যুদল একে একে ধৃত হইয়া রাজদণ্ড ভোগ করিতে লাগিল; দেশও নিরুপদ্রব হইল।

খুলনা হইতে বঙ্কিম ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুরে বদ্‌লী হন। সেই সময় গভর্ণমেণ্টের আমলাদের বেতন নির্দ্দেশের জন্য এক কমিশন বসে। হাইকোর্টের তদানীন্তন জজ প্রিন্সেপ বাহাদুর ঐ কমিশনের সম্পাদক ছিলেন। বঙ্কিম কিছুদিনের জন্য প্রিন্সেপের পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু কয়মাস পরেই তিনি আবার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটরূপে বহরমপুর যান। বহরমপুর হইতে মালদহ এবং মালদহ হইতে হুগলীতে বদলী হন। কর্ম্মসূত্রে তাঁহাকে নানাস্থানী হইতে হইয়াছিল।

এই সময়ে বঙ্কিমের বড় এক সম্মানের পদ লাভ হয়। বাঙ্গালীর ভাগ্যে এ পদ বড় দুর্ল্লভ। মেকলে সাহেব তখন গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটরিয়েট আপিসের কর্ত্তা। ডেপুটী বঙ্কিম এই সময় এই আপিসে আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর অফিসিয়েটিং পদ পান। মেকলে সাহেবের অধীনে তাঁহাকে কাজ করিতে হইত। স্বাধীনচেতা, ন্যায়পর ও তেজস্বী বঙ্কিমের ভাগ্যে কিন্তু অধিক দিন এ কাজ স্থায়ী হয় নাই। মেকলে সাহেব প্রতিদিন বাতি জ্বালাইয়া—কখন বা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত—কখন বা রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত আপিসের কাজ-কর্ম্ম করিতেন; কিন্তু আসিষ্টাণ্ট বা অধীন বঙ্কিম অপরাহ্ন ৫ টাও বাজিত, আর কাগজ-কলম ফেলিয়া উঠিতেন। এজন্য মেকলে একদিন বঙ্কিমকে একটু চাপিয়া ধরিলেন। তেজস্বী ও নির্ভীক বঙ্কিম অসঙ্কোচে উত্তর করিলেন,—"আপনারা রাজার জাতি, সুতরাং আপনাদের আশাভরসা ঢের; কালে চাই কি, আপনি লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণরের পদও পাইতে পারেন;—কিন্তু আমাদের আর বেশী আশা কি বলুন? তবে আর কেন খামকা হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া শরীর নষ্ট করি?"

উপরওয়ালা মেকলের সহিত বচসার ফলে হইল এই যে, বঙ্কিম পুনরায় ডেপুটী-রূপে আলিপুরে দেখা দিলেন।

উপরওয়ালা সাহেব হাকিমদের সহিত বঙ্কিমের প্রায়ই অবনিবনাও হইত। সুতরাং চাকরির উপর বঙ্কিমের চিরদিনই বিতৃষ্ণা ছিল। উপরওয়ালা সাহেব মাজিষ্ট্রেট, কখন্ কি অপমানের কথা বলেন, কখন্ কি অশিষ্ট ব্যবহার করেন,—অভিমানী,—আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানে অভিমানী, তেজস্বী বঙ্কিমের সে ভয় বড়ই ছিল। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের নিকট তিনি প্রায়ই বলিতেন,—"কোন উপায়ে গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী আয় হইলেই চাকরি ছাড়িয়া দিব।" এমন কি, একজন বর্দ্ধিষ্ণু বংশের ছেলেকে* ডেপুটীগিরি করিতে দেখিয়া, বঙ্কিম স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, "কি দুঃখে তোমাদের মত ধনি-সন্তান এরূপ চাকরী গ্রহণ কর?"—হায়! দাসত্বের প্রতি চিরদিন যাঁহার এরূপ বিতৃষ্ণা, তাঁহাকে জীবনের সুদীর্ঘকাল ঐ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল! এই দাসত্ব করিতে করিতেই তাঁহার গ্রন্থ প্রণয়ন। শুনিয়াছি, গ্রন্থ প্রণয়ন কালে বা গ্রন্থের কল্পনা মস্তিষ্কে বিচরণকালে, বঙ্কিম বাবু যখন এজলাসে বিচারকের আসনে বসিতেন, তখন তাঁহার সেই প্রতিভাপূর্ণ মুখকমল রক্তিমাভ হইয়া উঠিত এবং তাহাতে দারুণ বিরক্তি ও ঘৃণার একটা স্পষ্ট চিহ্ন প্রকাশ পাইত। তখন, তাঁহার সেই স্বাভাবিক গম্ভীর মূর্ত্তি আরও গম্ভীর হইয়া উঠিত। অধিকন্তু, বিচার করিতে করিতে সে সময় তিনি এক একবার অন্যমনা হইয়াও পড়িতেন। হায়! যে মস্তিষ্কে আনন্দমঠের 'সন্তান ধর্ম্মের' বীজ ঘুরিয়া বেড়াইত,—সেই মস্তিষ্ক কি বাদীর এজা-

হার, সাক্ষীর জবানবন্দী, প্রতিবাদীর কৈফিয়ৎ লইয়া সুস্থির থাকিতে পারে? তথাপি, সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন বঙ্কিম, বিচার-কার্য্যেও বিলক্ষণ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। কোন সাক্ষীকে প্রশ্ন করিবার সময়,—অগ্রে তিনি সেই সাক্ষীর আপাদমস্তক তীব্র-দৃষ্টিতে দেখিয়া লইতেন। সে দৃষ্টি,—সাক্ষীর মনের মধ্যে যাইত এবং তথা হইতে অনেক সময় অনেক গুহ্য কথাও টানিয়া আনিত।

একবার এক উদ্ধত সাহেব মাজিষ্ট্রেট আপন প্রভুত্ব দেখাইবার জন্য, বঙ্কিম বাবুর নিজ এজলাসে গিয়াই, বঙ্কিম বাবুকে অযথা ভর্ৎসনা করিবার উপক্রম করিলেন এবং অবজ্ঞা ও ঘৃণাভরে "বঙ্কিম" "বঙ্কিম" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন; কিন্তু সহিষ্ণুতা ও উপেক্ষার একটা সীমা আছে,—বঙ্কিম বাবু বিরক্ত হইয়া বলিতে বাধ্য হইলেন,—

"You should see, I am no longer "Bankim" now. I now represent Her Majesty's law and justice. You know I can at once order your arrest and pass sufficient punishment for insulting Her Majesty's court of justice".

তখন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের চৈতন্য হইল, তিনি বুঝিলেন, এতদিনে একটা মানুষের হাতে পড়িয়াছেন! আর বাক্যব্যয়টি না করিয়া, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তৎক্ষণাৎ বঙ্কিম বাবুর এজলাস হইতে চলিয়া গেলেন। *

* প্রদীপ—শ্রাবণ, ১৩০৬। ৺কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ—"বঙ্কিমচন্দ্র।"

স্বাধীনচেতা বঙ্কিম এইরূপে প্রতিনিয়তই দাসত্বের সহিত সংগ্রাম করিয়া মনে মনে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিলেন। যখন তিনি চাকরি ত্যাগ করিয়া পেন্‌সন লন, তখন সত্য সত্যই তাঁহার মনে অপার আনন্দ হইয়াছিল।—তাঁহার জীবনের একটা গুরু-ভার যেন তখন নামিয়া গেল। প্রকৃতির নগ্নপ্রাণ শিশু যেন সংসারের কঠিন অর্গল হইতে মুক্ত হইয়া প্রাণ পাইল। এই সময়ে বঙ্কিম বাবু কোন এক সাহিত্যসভায় এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া, আবেগভরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন,—"এইবার আমি মুক্তি পাইলাম,—এতদিনে আমার ঋণ পরিশোধ হইল!" হায়, দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশ! সামান্য জীবিকা অর্জ্জনের জন্য, বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির এই প্রাণঘাতিনী যন্ত্রণা!

এই আলিপুরেও উপরওয়ালার সহিত একটু খুটীনাটী হওয়ায়, বঙ্কিম কটকের অন্তর্গত জাজপুরে বদলী হইলেন। কিন্তু জাজপুর গিয়াই সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহাকে হুগলীতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। কয়েক মাস হুগলীতে ডেপুটী-গিরি করিয়া বঙ্কিম পুনরায় আলিপুরে বদলী হন। এখানে আবার উপরিতন রাজপুরুষের সহিত মনোমালিন্য ঘটিল। সেই কারণেও বটে এবং শারীরিক অসুস্থতাবশতও বটে,—১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি কর্ম্ম হইতে একেবারে চির-বিদায় গ্রহণ করিলেন। নির্দ্দিষ্টকাল উত্তীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া, অবশ্য পেন্‌সনও পাইলেন।

পেন্‌সন লইয়া, বঙ্কিম কলিকাতার নবপ্রতিষ্ঠিত "হায়ার ট্রেণিং"-এর সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই

সভায় বেদ সম্বন্ধে তিনি ইংরেজীতে একটি চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন; এবং নব্যতন্ত্রের পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে এই সময়ে তিনি হিন্দুর 'শাস্ত্র-প্রকাশ' কার্য্যে ব্রতী হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে ব্রত তাঁহার উদ্যাপিত হইল না। ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাঁহার বহুমূত্র রোগের সঞ্চার হইয়াছিল। সেই রোগ কালে দুষ্ট-ব্রণে পরিণত হইয়া, ১৩০০ সালের ২৬শে চৈত্র,—রবিবার বেলা ৩টা ২৩ মিনিটের সময় সকল স্মৃতি লোপ করিল। ১৩০০ সালের এই "যোড়া-শূন্যের" বৎসর,—দুর্ভাগ্য বঙ্গের অতি-বড় দুর্ব্বৎসর!—এই বৎসরে দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশ অনেকগুলি রত্ন হারাইয়াছে।

যাই হোক্, গভর্ণমেণ্ট বঙ্কিমের-সম্মানার্থ, বঙ্কিমকে যথাক্রমে "রায় বাহাদুর" ও "সি, আই, ই," উপাধি দিয়াছিলেন। এ উপাধি অন্যের পক্ষে যথেষ্ট হইলেও, সহৃদয় বাঙ্গালী পাঠকের মনের হিসাবে, আমাদের বঙ্কিম রাজরাজেশ্বর! অপিচ, উনবিংশ শতাব্দীর এই অশেষ উন্নতির দিনে বাঙ্গালীর এ বড় কম কলঙ্কের কথা নয় যে,—"কপালকুণ্ডলা," "কৃষ্ণকান্তের উইল"-রচয়িতার লেখনী,—তুচ্ছ জীবিকা অর্জ্জনের জন্য, 'খড়-চুরী' 'ধান-চুরী'র মোকদ্দমার 'রায়' লিখিয়া সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে! বড় ক্ষোভের কথা যে, প্রতিভার পূজা করিতে বাঙ্গালী আজও শিখে নাই!

পুত্রমুখ-দর্শন বঙ্কিমের অদৃষ্টে ঘটে নাই;—তাঁহার তিনটি মাত্র কন্যা। ঈশ্বরেচ্ছায়, দৌহিত্র অনেকগুলি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, কনিষ্ঠা কন্যাটির শোচনীয় মৃত্যুতে তিনি বড়ই মর্ম্ম-পীড়িত হন এবং কতকটা আত্মহারা হইয়া পড়েন। ইতিপূর্ব্বে

পিতৃ-বিয়োগ, মাতৃ-বিয়োগ ও ভ্রাতৃ-বিয়োগ ক্লেশও তাঁহাকে সহিতে হইয়াছিল। শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমের পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করেন। এক শ্যামাচরণ বাদে—ইহাঁরা সকলেই সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্য-সেবী।

সাহিত্যে সঞ্জীবের প্রতিভাও বড় কম নয়। সঞ্জীবের “জাল প্রতাপচাঁদ”, “কণ্ঠমালা”, “পালামৌ”—ভ্রমণবৃত্তান্ত, গুটি দুই ছোট গল্প অতীব সুখপাঠ্য। সঞ্জীবের ভাষার কোনরূপ আড়ম্বর নাই।—ভাষাটি অতি সরল, স্বচ্ছ, ধীর, পবিত্র—স্থানে স্থানে কবিত্ব-যূথিকার স্নিগ্ধ গন্ধে প্রাণ আমোদিত হয়। পূর্ণ-চন্দ্র ডেপুটী মাজিষ্ট্রেরী করিয়া কিছুদিন হইল, পেন্‌সন লইয়াছেন। তিনি একজন বিচক্ষণ ডেপুটী ছিলেন, এবং “শৈশব-সহচরী” “মধুমতী” প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।

বঙ্কিমের ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ,—অতি অদ্ভুত রকমে হইয়াছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রায় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিমের পিতৃদেব,—অতি সাত্ত্বিক-প্রকৃতির মহাশয় লোক ছিলেন। জনশ্রুতি,—তাঁহার এক ঐশীশক্তি-সম্পন্ন গুরু ছিলেন। গুরু—সন্ন্যাসী। যাদবচন্দ্রের পরলোক গমনের কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ মহাপুরুষ আসিয়া বলেন,—“অন্তিমকালে আমি তোমাকে দর্শন দিব।” এই বলিয়া একটা দিন নির্দ্দিষ্ট করেন। যথাদিনে পুত্রগণ পিতাকে ৺গঙ্গাতীরস্থ করিয়াছেন, এমন সময় সেই মহাপুরুষ তথায় আবির্ভূত হইলেন। সে দৃশ্য দেখিয়া এবং তাঁহার আরও কিছু অলৌকিক মাহাত্ম্যের পরিচয় পাইয়া, বঙ্কিম তাঁহার চরণে শরণ লন, এবং সেই হইতেই তাঁহার ধর্ম্মজীবন লাভ হয়।

জনশ্রুতি এইরূপ বটে; কিন্তু বঙ্কিমের এক জন পরম অন্তরঙ্গ সুহৃৎ,—ইহার বহু পূর্ব্বেই বঙ্কিমের ধর্ম্মজীবনের বিশিষ্ট প্রমাণ দেখাইয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসুজ মহাশয় "প্রদীপ" নামক মাসিকপত্রে, "বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র" নামক প্রবন্ধের একস্থলে লিখিয়াছেন;—

বঙ্কিম বাবুর "কাঠালপাড়ার বাড়ীতে অনেকবার গিয়াছিলাম। একবারের কথা বলি। নবমী পূজার দিন প্রাতে গেলাম। সঞ্জীব বাবু, বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি পূজার দালানে বসিয়া আছেন। দেবীকে প্রণাম করিয়া বসিতে যাইতেছি, বঙ্কিম বাবু বলিলেন,—'তা হবে না, রাধানাথকে প্রণাম করিয়া আসিয়া ব'স। দেবীর প্রতিমার দক্ষিণ পার্শ্বে সুন্দর বিগ্রহ দেখিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এই বিগ্রহের কথা কহিতে বড় ভাল বাসিতেন। বলিতেন,—উনি আমাদের বংশের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল বিধান করেন, সমস্ত দুর্গতি নাশ করেন, আমাদের সকল কথা শুনেন, সব আব্দার রক্ষা করেন, রোগে শোকে বিপদে আমরা উহাঁরই মুখ চাহিয়া থাকি, উহাঁকেই ধরি, উনি আমাদিগকে বড় ভালবাসেন। বঙ্কিম বাবু এমন সরল ভাবে এবং ভক্তিভরে রাধানাথের কথা কহিতেন যে, শুনিতে শুনিতে আমার চক্ষে জল আসিত। একবার বঙ্কিম বাবুর স্ত্রীর একখানি অলঙ্কার চাহিয়া পাঠাই। বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছিলেন— "অলঙ্কার খানি এখন পাইবে না; আমার আরোগ্য কামনা করিয়া আমার স্ত্রী উহা রাধানাথের নিকট বন্ধক রাখিয়াছিলেন, এখনও উদ্ধার করা হয় নাই।"

ইহা অবশ্য অনেক দিনের কথা;—বঙ্কিম বাবুর যৌবন

কালের কথা। তখন বঙ্কিম বাবুর পিতা জীবিত। তবেই বুঝিয়া দেখুন, উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে থাকিলেও, যৌবনেই বঙ্কিমের জীবনে ধর্ম্মের মধুরমোহন ছবি জাগিয়াছিল। তবে, তখন কুসংসর্গটা অত্যন্ত অধিক হওয়ায় সে ছবি তেমন ফুটিতে পায় নাই।

'মন্ত্রশক্তি'তে বঙ্কিমবাবুর বিশেষ আস্থা ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ ৺কালীনাথ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন ;—* * * "আমার কথা শেষ হইবামাত্র বঙ্কিমবাবু বলিয়া উঠিলেন যে, তিনি ঠিক ঐ মন্ত্রটী জানেন। এই মন্ত্রটীর কোন বিপরীত ফল ফলিবার আশঙ্কায় (তিনি) সকলকে মন্ত্রের প্রয়োগ শিখাইতেন না। তবে হাকিম বা সাহেব বশীভূত করিবার জন্য অনেক লোককে ঐ মন্ত্রের প্রয়োগ শিখাইয়াছিলেন। একবার মাত্র তিনি কোন হতভাগিনী স্ত্রীলোককে তাহার অননুরক্ত স্বামীকে বশীভূত করিবার জন্য মন্ত্রটীর প্রয়োগ শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, সেই হতভাগিনী সেই মন্ত্রটী তদীয় স্বামীর প্রতি প্রয়োগ না করিয়া, তাহার অযথা অপব্যবহার করে।" *

জ্যোতিষশাস্ত্রেও বঙ্কিমবাবুর বিশেষ আস্থা ছিল। স্বয়ং চেষ্টা করিয়া, জ্যোতিষ কিছু কিছু শিখিয়াও ছিলেন।

এই গেল বঙ্কিমের স্থূল জীবনী। সূক্ষ্ম জীবন-কথা যিনি শুনিতে চান, তিনি মূল গ্রন্থ পাঠ করুন। পড়িতে পড়িতে হয়ত দুই একটা কথা মনে ধরিতে পারে।

আর একটা কথা বলিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

* প্রদীপ—ভাদ্র, ১৩০৬।

সংসারী জীবের আপনার জনের প্রতি স্নেহ বা টান্ সকলেরই আছে ;—কাহারও কম আছে, কাহারও বেশী আছে। কিন্তু কবির স্নেহ,—বঙ্কিমের ন্যায় (বাহ্য কঠিন—অন্তর কোমল) কবির স্নেহ বড় কম দেখিয়াছি। সে স্নেহের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র। পাত্রভেদে সে স্নেহের তারতম্য হইয়াছে বটে ; কিন্তু সে স্নেহের ধাতই এক রকম। যে, সে স্নেহে বঞ্চিত হইয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, কি অপার্থিব অমূল্য-নিধি সে হারাইয়াছে! বঙ্কিম বাবু যাহাকে ভাল বাসিতেন, তাহাকে প্রাণের সমান ভাল বাসিতেন। সে ভালবাসা কেমন, তা যিনি নিজ জীবনে পাইয়াছেন, তাঁহার মুখেই শুনুন ঃ—

* * * "সুন্দর হাসি হাসিতে হাসিতে বঙ্কিম বাবু হাত বাড়াইয়া দিলেন। দেখিলাম, হাত উষ্ণ। সে উষ্ণতা এখনও আমার হাতে লাগিয়া আছে! সে হাত পুড়িয়া যায় নাই—আমার হাতের ভিতরেই আছে! যে ভালবাসাইয়া যায়, আগুনে তাহাকে পোড়াইতে পারে না। * * * বঙ্কিম বাবুর খাওয়াইবার বন্দোবস্ত বড় চমৎকার ছিল। আদরের খাওয়া ভিন্ন কখনও তাঁহার কাছে খাই নাই। যখনই গিয়াছি, দুই এক দণ্ড পরেই নানা সামগ্রী প্রস্তুত দেখিয়াছি। যখনই আসিতে চাহিয়াছি, তখনই নানা সামগ্রী খাইয়া আসিয়াছি। ভাবিতাম, এ সব কি মন্ত্রে প্রস্তুত হয়! শীঘ্রই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, মন্ত্রেই প্রস্তুত হয়, আর তাঁহার পত্নীই সে মন্ত্র। * * * (এক দিন) বঙ্কিম বাবু তাঁহার আনন্দমঠের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। একটা জায়গা খুব ভাল লাগিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল, হুঁকার নলটা হাতে করিয়া বসি।

বলিলাম, 'এমন সময়ে একজন চাকরকেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।' বঙ্কিমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ পড়া বন্ধ করিয়া উঠিয়া গেলেন। মনে করিলাম, ধমক ধামক করিতে গেলেন। কিন্তু সে সব কিছু শুনিলাম না। পাঁচ সাত মিনিট পরে আপনি তামাক সাজিয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে আসিয়া বলিলেন— 'খাও'।*" * * *

প্রেমপ্রবণ হৃদয়ের এ অবস্থা বুঝাইবার নহে,—পাঠক নিজেই ইহা অনুভব করুন। আমরা আর কিছু বলিব না।

---

*৺চন্দ্রনাথ বসু-লিখিত "বন্ধু-বৎসল বঙ্কিমচন্দ্র"।—প্রদীপ,—আষাঢ় ১৩০৫।

বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম।

১

বিশীর্ণা স্রোতস্বতী ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল। তেমন উন্মত্ত আবেগ, উচ্ছৃঙ্খল তরঙ্গ-ভঙ্গ, কূল-প্লাবী চাঞ্চল্য,—কিছুই পরিদৃষ্ট হইত না। বৃন্তচ্যুত, বিশুষ্ক পুষ্প যেমন নিঃশব্দে ভূপতিত হয়, স্রোতস্বতীর গতি তেমনই শব্দহীন, প্রাণহীন,—কেবল আকর্ষণের বলে গতিমাত্রে অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হইতেছিল। পথিক তৃষিত প্রাণে স্রোতস্বতী-পানে ছুটিতেছে,—সে পঙ্কিল, দুর্গন্ধময় জলে তৃষা মিটিতেছে না,—অতৃপ্ত হৃদয়ে আকুল প্রাণে ফিরিয়া আসিতেছে। পিপাসা যত বাড়িতেছে, প্রাণে ব্যাকুলতা ততই উদ্রিক্ত হইতেছে।

এমনই সময়, সহসা সেই বিশীর্ণহৃদয়া স্রোতস্বতী পূর্ণতোয়া হইয়া—স্ফীত-হৃদয়ে, পরিপূর্ণ আবেগে কূল ভাসাইয়া প্রবাহিত হইল। বিশুষ্ক সাহারা "সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা" ভূমিতে পরিণত হইল। শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল। কুসুমিত তরুশাখায় মধুরকণ্ঠ বিহগ মধুর তান ধরিল। প্রকৃতি হাস্যময়ী হইল। পরম পুলকিত অন্তরে, প্রীতিভরে এইবার সেই তৃষার্ত্ত পথিক-কূল নদীতটে বসিল;—শরীর স্নিগ্ধ হইল, প্রাণ জুড়াইল।

সেই একদিন গিয়াছে, আর আজিও এক দিন চলিয়াছে। সেই কাঙ্গালিনী বঙ্গভাষা আজি নানা রত্ন-সুশোভনা। মরকত মণিমাণিক্যে ভিখারিণীর ভাণ্ডার আজি পূর্ণ। ভিখারিণী তখন বঙ্গবাসীর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারে নাই, এবং বুঝিতে পারিলেও তাহা পূরণ করিতে সক্ষম হয় নাই। হৃদয়ে সে অপরিতৃপ্ত আশা লইয়া বঙ্গবাসী সে সময় যাহা পাইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছে। ভাল মন্দ বিচার করে নাই; বিচার করিবার সামর্থ্যও ছিল না;—কিন্তু বুঝিত, প্রাণের অভাব ইহাতে মিটিতেছে না। তৃষা বাড়িত, আকাঙ্ক্ষা মিটিত না। সেই দুর্দ্দিনে, আমাদের পরম সৌভাগ্যবলে, কাহার নবীনা প্রতিভা অজস্রধারে সুধা বর্ষণ করিল! সে সুধাপানে বাঙ্গালী ধন্য হইল, দুঃখিনী বঙ্গভাষা নবজীবন লাভ করিল।

সেই সব কথা আজি মনে পড়ে। মনে পড়ে, যখন পাদরী-সাহেব-সম্প্রদায় সর্ব্বপ্রথম এ দেশে বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক মুদ্রিত করিয়া প্রচারিত করেন। তার পর, একে একে বাঙ্গালার অনেকগুলি সুসন্তান ভাষার উন্নতি-কল্পে ব্রতী হন। মৃত-মহাত্মা রামমোহন রায়—কিছুকাল পরে হইলেও, সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ্যযোগ্য। তাঁহার সময় হইতে আজি পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধানতঃ চারিটি স্তর দেখিতে পাই। প্রথম স্তর,—ভাষা গ্রাম্যদোষ-দুষ্ট ও অস্পষ্ট, এবং ভাব নিতান্ত অপরিস্ফুট ও ম্লান। দ্বিতীয় স্তর,—সংস্কৃতের একাধিপত্য,—সুতরাং অনেক স্থলে নিরর্থক শব্দাড়ম্বর ও তজ্জন্য ভাব-জটিলতা। তৃতীয় স্তরেই বাঙ্গালীর সৌভাগ্য-সূর্য্য অল্পে অল্পে দেখা দিল। এ স্তরের প্রধান নেতা,—মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত।

সাহিত্যের স্রোত একটু ফিরিল। কিন্তু তবুও বঙ্গবাসীর আশা মিটিল না।

এই সময়ে আর একজন শক্তিশালী লেখক দেখা দিলেন। "বঙ্গসাহিত্যে ৺প্যারিচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের স্থান অনেক উচ্চে।"* তিনিই প্রথম পথ দেখাইলেন, কেবলমাত্র খাঁটী বাঙ্গালা লিখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি করা যাইতে পারে। কিন্তু তবুও সাহিত্য-সূর্য্য মেঘমুক্ত হইল না। ভাষা অনেকাংশে সরল, তরল ও ঢলঢল হইল বটে, কিন্তু তাহাতে প্রাণ রহিল না,—নদীতে তরঙ্গ উঠিল না।

এই সময়ে প্রকৃতির অন্তরালে নব্যবঙ্গের নেতা, প্রতিভার পূর্ণ অধিকারী, প্রকৃত সাহিত্য-গুরু জন্মগ্রহণ করিলেন;—যাঁহার অমৃতময়ী কথা আলোচনা করিয়া আজি আমি আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিব।

পূর্ব্বাবধি এমনই একটা রহস্য জগতের বুকে লুকানো আছে, যাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। ধর্ম্মে বা সমাজে অথবা সাহিত্যে যখনই কোন বিশেষ অভাব পড়িয়াছে, বিধাতার বিধানে, তখনই কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া অপূর্ব্ব সাধনাবলে সে অভাব পূর্ণ করিয়া চলিয়া যান এবং মানব-হৃদয়ে প্রবল আধিপত্য স্থাপন করিয়া এই মরজগতে অমরত্ব লাভ করেন।

বর্ত্তমানের বিষয় আলোচনা করিতে বসিয়া আজ অতীতের অনেক স্মৃতি জাগিতেছে। বঙ্গভাষায় যখন সব থাকিয়াও যেন কিছু নাই,—যখন ভাষা শব্দ-সম্পদে সৌভাগ্যশালী হইলেও

* এ কথা স্বয়ং বঙ্কিম বাবুই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

একরূপ অচেতন বা প্রাণহীন, তখন অতি নিভৃতে, বীণাপাণির পদতলে বসিয়া, "সাহিত্য-ক্ষেত্রের কর্ম্মবীর" অপূর্ব্ব সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিতেছিলেন। কাল পূর্ণ হইল, সেই কর্ম্ম-বীরও কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন;—প্রতিভাবলে সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

বঙ্কিমের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। এ যুগে, এমন প্রতিভা আর কোথাও দেখি না। মনের কথা খুলিয়া বলিলে হয়ত কেহ কেহ রাগ করিবেন,—তথাপি অম্লানবদনে বলিব, সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্য একদিকে, আর একা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা-ভাণ্ডার একদিকে! কারণ, সমগ্র বাঙ্গালী নরনারীর হৃদয়ের উপর তিনিই প্রবল আধিপত্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এ যুগে, এমন সৌভাগ্য, আর কাহারও হয় নাই। বঙ্কিম বলিতে বাঙ্গালার একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বুঝায়। সত্যই বাঙ্গালীর মধ্যে,—বঙ্গসাহিত্য-রাজ্যে "বঙ্কিম" একজন মাত্র। বঙ্কিমকে প্রথম আসন দিয়া, ঐ প্রথম আসনের গুণের তুলনায়,—ঠিক দ্বিতীয় আসনে বসিবার উপযুক্ত ব্যক্তি আর কে? মুখে কেহ স্বীকার করুন আর নাই করুন,—কোন-না-কোন প্রকারে এ যুগে বঙ্কিমের শিষ্য নয় কে? যিনি বঙ্কিমকে গালি পাড়েন, তিনিও সেই বঙ্কিমী-ঢঙে "শাদার পিঠে কালি" দিয়া থাকেন! তাই বলিতেছিলাম, যতদিন বঙ্গভাষা, ততদিন বঙ্কিম; যতদিন বাঙ্গালী, ততদিন বঙ্কিম! কবি রবীন্দ্রনাথের সহিত আমিও একবাক্যে বলি,— 'তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া, বঙ্গসাহিত্যে ভাব-মন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্যস্রোত-স্পর্শে জড়ত্ব শাপ মোচন করিয়া, আমাদের প্রাচীন

ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন, ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, এ কথা কোন বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য"। *

বস্তুতঃ, বঙ্কিম অপূর্ব্ব সাধনা-বলে, সেই ক্ষীণ-হৃদয়া, রুদ্ধ স্রোতস্বতীকে,—প্রাণ দিয়া, প্রেম দিয়া, উন্মাদিনী গতি দিয়া,—সাগরের সহিত মিলিত করিয়া দিয়াছেন। "আলালী" ও "সাগরী" ভাষারূপ জমির উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া, তিনি সাহিত্যের চতুর্থ স্তর অক্ষয় ও অজেয় করিয়া গিয়াছেন। তবে দুঃখ এই, মহারথ অর্জ্জুনের শরাঘাতে-বিদীর্ণা ভোগবতীর ন্যায় বঙ্কিম-বিরহে নেতৃহীন বঙ্গ-ভাষা আজি শতধারে বুক ভাসাইতেছে। কারণ, তাহার সকল সাধ আজিও মিটে নাই। সাধ মিটিতে-না-মিটিতে আজ সে রক্ষকহীনা।—এই অরক্ষিত অসহায় অবস্থায় অভাগিনীকে লইয়া, যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করিতেছে।

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত "বঙ্কিমচন্দ্র।—সাধনা।

২

সাহিত্যের অবস্থা তখন কিরূপ ছিল, তাহা আমরা সংক্ষেপে, উপরে একরূপ বলিয়া আসিয়াছি। ফল কথা, প্রথম তিন স্তরের ভাষা যেরূপ হউক, ভাবের একান্ত অভাব ছিল। এ কথা বোধ হয়, সর্ব্ববাদিসম্মত। ভাবহীন ভাষা যতই আড়ম্বর-পূর্ণ হউক, প্রকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট তাহার কোন মূল্য নাই। দীর্ঘ-সন্ধি-সমাসযুক্ত বাক্যচ্ছটা ও বর্ণনা-ঘটা দেখিতে, শুনিতে এবং স্থল-বিশেষে পড়িতেও মন্দ নয় বটে, কিন্তু তাহা 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করে না; সে কথা বুকে বিদ্ধ হয় না। ছোট ছোট ভাবময়ী কথা কিন্তু মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে। এই জন্যই গীতিকবিতার এত আদর। এই জন্যই বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব-কবি—কাব্য-জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। প্রতিভাবান্ বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যের ভাষা,—সেই গীতি-কবিতার ছাঁচে ঢালা। বঙ্কিমের প্রাণময়ী, মর্ম্ম-স্পর্শিনী ভাষা পড়িতে পড়িতে এক একবার আমার মনে হয়, যেন গদ্যে কোন গীত-কবিতা পড়িতেছি। স্থানান্তরে আমি এ কথা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইব। কিন্তু বঙ্কিমের পূর্ব্বে, বাঙ্গালা সাহিত্য, এ রসের কাঙ্গাল ছিল। হয় কতকগুলা আভিধানিক 'কটমট' শব্দ,—অনুস্বার-বিসর্গহীন সংস্কৃত,—

কেবল অক্ষরগুলা বাঙ্গালা;—নয় ঘোর গ্রাম্যদোষ-দুষ্ট—পাটোয়ারী-ছাঁদের মুসবিদা,—সমাপিকা অসমাপিকা ক্রিয়ার ছড়াছড়ি,—অধিকন্তু 'এবং' 'ও' 'অপিচ' প্রভৃতির বাড়াবাড়িতে সুকুমার সাহিত্যের স্থান পূর্ণ করিত। দৃষ্টান্ত উদ্ধারের আবশ্যক নাই,—এ কথা বোধ হয় ভাষাবিৎ নিরপেক্ষ ব্যক্তি-মাত্রেরই অনুমোদিত।

সোজা কথায় বলিতে গেলে এই বলিতে হয়, ভাবের অভাব ছিল বলিয়াই ভাষায়ও তখন জীবনীশক্তি ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় এক হিসাবে ভাষার জন্মদাতা ও গুরু বটেন,—ভাষাও তাঁহার খুব মিষ্ট বটে, কিন্তু সে ভাষাতেও যেন প্রাণের অভাব দেখিতে পাই! অমন মধুময়ী ভাষাও যেন কেমন বিনাইয়া-বিনাইয়া, শ্রোতৃবৃন্দের মুখের পানে চাহিয়া-চাহিয়া, রচিত বলিয়া মনে হয়। দুঃসাহস হোক্ আর যাহাই হোক্,—স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে যখন এই মত প্রকাশে আমি বাধ্য হইলাম,—তখন ভরসা আছে, সত্যের মুখের পানে চাহিয়া,—সাহিত্যের মর্য্যাদা স্মরণ করিয়া,—আমার যথাজ্ঞান,—আমি এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ে সরলভাবে আপন মত প্রকাশ করিতে পারিব। আসল কথা, ভাবযুক্ত মর্ম্মকথা ভাষার পক্ষে যত কার্য্যকরী, ফেনাইয়া বা ফাঁপাইয়া অবাস্তব শব্দাবলীর সংযোজনে,—ভাষার পরিপুষ্টি তো দূরের কথা,—প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাতে সাহিত্য-ভাণ্ডারে আবর্জ্জনা বৃদ্ধি পায়। একটি ক্ষুদ্র যূথিকা-পুষ্প যে সৌরভ দান করিবে, রাশীকৃত করবীরেরও সাধ্য কি যে, তাহার স্থান অধিকার করে!

সাহিত্যের এইরূপ সমালোচনা করিতে করিতে, তদানীন্তন সমাজের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। কারণ সাহিত্যের উন্নতি-অবনতির পক্ষে সমাজও কতকটা দায়ী। সমাজের শিক্ষা, দীক্ষা, ও রুচি-প্রবৃত্তির সহিত সাধারণ সাহিত্য-সেবীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তখনকার সমাজের সাধারণ-শিক্ষা খুবই কম ছিল। মোটামুটী বৈষয়িক কাজ চালাইবার উপযোগী শিক্ষাই তখন একরূপ যথেষ্ট ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য, "পড়ুয়া পণ্ডিত" ও শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করিতেছি না। নূতন-আমদানী ইংরেজী-ঢঙে তখন দেশ মাতোয়ারা। "নিমচাঁদ"-রূপী বহু শিক্ষিতপুঙ্গব তখন বঙ্গ-সমাজে বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং সমাজে তখন গলদ ঢের। সে সব সমাজকালিমা দেখাইবার সাধ আমাদের নাই। তবে এখানে কেবলমাত্র তদানীন্তন সমাজের রুচির বিষয়ে কিছু উল্লেখ করিব।

সরস রসিকতা, অবশ্য সর্ব্বদেশে, প্রায় সর্ব্ব সময়েই প্রশংসনীয়। কিন্তু এই রসিকতার নামে ঘোর অরসিকতা বা নীরসতা তখনকার দুর্ভাগ্য বঙ্গসমাজের এক-চেটিয়া ছিল। ভাঁড়ামী, ফাজ্‌লামী, গ্রাম্য-ইয়ারকি ও অশ্লীল ভাষায় গালা-গালিকে তখনকার অনেকে 'রসিকতা' বলিয়া জানিত। অল্প-দর্শী লেখকগণও তাই 'বাহবা' পাইবার লোভে, কেতাবে এবং কাব্যে সেই সব পূতিগন্ধময় পাপ আবর্জ্জনা সংগৃহীত করিতেন। লিপিকুশল লেখক না হয় সে-গুলা একটু গুছাইয়া লিখিতেন। কিন্তু ভাঁড় যতই 'তুখোড়' হউক, চিরদিনই সে ভাঁড় ;—রঙ্গ-দর্শক বুদ্ধিমান্ পাঠকের নিকট সে কখনই শ্রদ্ধার আসন পাইবে

না। অবশ্য, এ সব খুচরা কবি ও লেখকদের জন্য তখনকার সমাজও কতকটা দায়ী। এই জন্যই বলিতেছিলাম, সমাজের সহিত সাহিত্যের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

মনস্বী সমালোচক, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,—'প্রাচীন সাহিত্যালোচনা' উপলক্ষে কথাটা বেশ পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন :—"জাতীয়-সাহিত্য জাতীয়-জীবনের প্রতিরূপ। কবির হৃদয় প্রশস্ত দর্পণ তুল্য; যে কালের জাতীয়-জীবনের যে ভাব,—জাতির যাহা রীতি-নীতি, প্রণালী-পদ্ধতি,—সেই কালের কবির কাব্যে তাহার ছায়াপাত দৃষ্ট হয়।—সেক্সপীয়র যে নাটকে স্বভাবের প্রতিবিম্ব গ্রহণের উল্লেখ করিয়াছেন, সে এই মর্ম্মের কথা। এ হিসাবে কবি সম-সাময়িক কালের নিপুণ ঐতিহাসিক। কত সহস্র বৎসর বৈদিক-যুগ অতীত হইয়াছে;—সে বৈদিক ঋষি, বৈদিক যাগ, বৈদিক জীবন, বৈদিক আচার-ব্যবহারের চিহ্নমাত্র নাই;—কিন্তু বেদের সূক্তে তৎসমুদয়ের কেমন সুস্পষ্ট ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে"। *

কথাটি অতি সত্য। কিন্তু এ কথাটির সহিত আমি আর একটু যোগ করিতে চাই। সেটুকু এই;—প্রকৃত প্রতিভাবান্ কবি বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতের কেন্দ্রীভূত করিয়া তাঁহার সাধের আলেখ্য অঙ্কিত করেন। অর্থাৎ জীবনের উচ্চ আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া কবি এক নূতন জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সে জগৎ পুণ্য-পবিত্রতাময়, সুখশান্তিপূর্ণ এবং দৈহিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলকর। কবির কল্পনা-প্রসূতা মানস-দুহিতা এই পৃথিবী তাঁহার ভবিষ্য বংশধরগণ উপভোগ করেন।

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

কেবলমাত্র বর্ত্তমান সমাজ তাঁহার লক্ষ্যস্থল হইতে পারে না।—অত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তাঁহার সেই উদার কল্পনা ও বিশ্বজনীন প্রেম আবদ্ধ থাকিতে পারে কি? তাই তিনি আবশ্যক বোধে বর্ত্তমানকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া সুদূর ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হন;—যুগ যুগ ধরিয়া যাহার বিমল-রশ্মি নিখিল সংসার উপভোগ করিতে থাকে। তাই উচ্চশ্রেণীর কবির সেই অপূর্ব্ব আলেখ্য-দর্শনে বর্ত্তমান সমাজের যেমন হিত হয়, সময় বিশেষে তেমনই অহিতও সংঘটিত হইয়া থাকে। এ অহিত সত্ত্বেও কবি জগতের পূজ্য,—সমগ্র নরনারীর পরম প্রীতির পাত্র। কারণ প্রকৃত কবিই বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের পথ-প্রদর্শক। দার্শনিক বা ঐতিহাসিকের গভীর গবেষণায়ও যে তত্ত্ব প্রকটিত না হয়,—মাহেন্দ্র-যোগ-সংঘটনে,—কবির ক্ষণমাত্র চিন্তায়ও সে রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে।—প্রকৃত কবির তুল্য বন্ধু আর কে?

বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রকে উপলক্ষ্য করিয়াই আমরা ঐ সকল কথা বলিয়া আসিয়াছি। কারণ, আদর্শ-মূলক উপন্যাসেই (idealistic novels) বঙ্কিম সিদ্ধহস্ত।—সমাজ যেমন আছে, ঠিক তেমন নহে,—কিন্তু সমাজ যেমন হইতে পারে বা হওয়া উচিত, সেইরূপ আদর্শ লইয়া তিনি তাঁহার উপন্যাসের 'ছক্' প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং সেই ছক্ সম্মুখে রাখিয়া এক একটি চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। কারণ, "কবির সৃষ্টি জগৎ হইতে স্বতন্ত্র নহে। জগতের বুকে যে কথা লুকান আছে, হৃদয়ের ভাষায় তাহা পরিব্যক্ত করিয়া কবি আপনার জগৎ সৃষ্টি করেন। সৌন্দর্য্যই জগতের প্রাণ, সৌন্দর্য্য কাব্যেরও প্রাণ। সুতরাং কবির প্রধান কাজ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি"।

কবির আদর্শ বিচিত্র রামধনুর ন্যায়;—কত বর্ণ, কত শোভা, কত সৌন্দর্য্য! রামধনু যেমন আকাশের গায়ে অবস্থিত, কবির আদর্শও তেমনই তদ্বিরচিত কাব্যে চিত্রিত। তুমি যতই অগ্রসর হইবে, রামধনুও ততই পিছাইয়া যাইবে,— আবার তুমি যেমন পশ্চাৎ হটিয়া আসিবে, রামধনুও তেমনই মনোহর মূর্ত্তিতে তোমার সম্মুখে প্রকটিত হইতে থাকিবে। কবির আদর্শও এইরূপ। তুমি আমি সে আদর্শে উপনীত হইতে পারিতেছি না বলিয়া কি কবি সে আদর্শকে খাটো করিবেন? সংসার সৌন্দর্য্যময়। কবি এ সৌন্দর্য্যের হাটে আপনা হারাইয়া, তাঁহার সাধের আলেখ্যখানি লইয়া বসেন;—তুমি দেখ আর নাই দেখ, তিনি এই আলেখ্যখানি আঁকিয়াই সুখী। প্রকৃত কবি ভিন্ন সৌন্দর্য্যের ধ্যান আর কে করিতে পারে? তাই "সারদামঙ্গলের" সেই সাধক কবি—এক দিন হৃদয়ের পরিপূর্ণ আবেগে গাহিয়াছিলেন,—

"তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোক গে এ বসুমতী যার খুসী তার"।

বঙ্কিমচন্দ্রের সৌন্দর্য্যসৃষ্টি তদ্বিরচিত প্রায় সকল উপন্যাসেই বিশেষরূপে দেখিতে পাই। বিশেষতঃ, তাঁহার "কপালকুণ্ডলা" এ বিষয়ে অতুল্য। যথাস্থানে আমরা সে সকল কথার আলোচনা করিব।

বঙ্কিমের পূর্ব্বে বঙ্গ-সাহিত্য ও বঙ্গসমাজের যেরূপ অবস্থা, তাহা আমরা অতি সংক্ষেপে, দুই চারি কথায় বলিয়াছি। কিন্তু সৌভাগ্যবশে, তখন অমর মধুসূদন জীমূতমন্দ্রে "মেঘনাদের" ভেরী বাজাইয়াছেন। রঙ্গলালও ওজস্বিনী ভাষায় "স্বাধীনতা

হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে" বলিয়া বীণায় ঝঙ্কার দিতেছেন। ইহা ব্যতীত মনস্বী ভূদেব "ঐতিহাসিক উপন্যাস" বিরচিয়াছেন ;—কালীপ্রসন্ন সিংহ "হুতমে" বাহবা লইতেছেন ;—রামনারায়ণের "নবনাটক" ও "রুক্মিণীহরণ" এবং দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" ও "লীলাবতী" তখন একে একে দেখা দিতেছে। অধিকন্তু ইহারও পূর্ব্বে 'গুপ্ত-কবি' ঈশ্বরচন্দ্র,—বঙ্কিমচন্দ্রের গুরু,—এক শ্রেণীর পাঠকের নিকট আসর জমাট করিয়া বসিয়াছিলেন। অতঃপর শুভক্ষণে প্যারিচাঁদ মিত্র সরল ও সরস ভাষায় "আলালের ঘরের দুলাল" প্রণয়ন করিলেন। দেশ মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। একদিকে সংস্কৃত-পক্ষপাতীদল ক্ষেপিয়া উঠিলেন ; অন্যদিকে নব্য-তন্ত্রের পাঠকবৃন্দ সাগ্রহে "আলালী ভাষা" পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, উভয় দলই প্রতারিত হইলেন।—কিছুদিনের মধ্যে সে "আলালী" ভাষার উপরও কালের যবনিকা পড়িয়া গেল।

৩

এইবার প্রকৃতির প্রিয়পুত্র,—জননী-জন্মভূমির সুসন্তান বঙ্কিমচন্দ্র দেখা দিলেন। মেঘমুক্ত সূর্য্য চারিদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া প্রকাশিত হইল। চারিদিকে আনন্দের রোল পড়িয়া গেল।

এইবার প্রকৃত গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনানৈপুণ্য, মৌলিকতা, স্বাধীন চিন্তা, ও জাতীয় ভাব,—এইবার গদ্যসাহিত্যে প্রবেশলাভ করিল। ইহার উপরও প্রতিভার একটি উচ্চ নিদর্শন প্রকটিত হইল,—যাহা আমাদের বঙ্কিমের সম্পূর্ণ নিজস্ব। রসজ্ঞ বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে "নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য" আনয়ন করেন।—"তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে; উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্য-জ্যোতির সংস্পর্শে কোন বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য্য ও রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্ব্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে বঙ্কিম বঙ্গ-সাহিত্যের গভীরতা

হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন, সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়-শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গ-সাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।" * কবি রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম বাবুর এই "শুভ্র সংযত হাস্যকে" "ব্রাহ্মণোচিত শুচিতা"র সহিত তুলনা করিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। শুধু হাস্যরস বলিয়া কেন, প্রায় সকল রসেই বঙ্কিমের এই "ব্রাহ্মণোচিত শুচিতা" পরিলক্ষিত হয়।

লোকবিশ্রুত "দুর্গেশনন্দিনী" উপন্যাসই বঙ্কিমের সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তাঁহার প্রতিভার সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি প্রকাশ না পাইলেও,—স্বাধীনচিন্তা, সরস রসিকতা ও জাতীয়ভাব,—বঙ্গ-সাহিত্যে এই প্রথম প্রবেশলাভ করিল। সিংহ-শিশু সাহিত্য-কাননে আবির্ভূত হইবামাত্র ফেরুপাল তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। দলাদলিপ্রিয় বাঙ্গালী বঙ্কিমকে লইয়া নানারূপ কুৎসিত হাস্য-পরিহাস আরম্ভ করিয়া দিল। প্রথমতঃ তাঁহার ভাষা লইয়া পণ্ডিত-মহলে খুব বড় একটা 'ঘোট' হইতে লাগিল। "শব-পোড়ান" ও "মড়াদাহ"-রূপ ভাষা বঙ্কিম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, অতএব বাঙ্গালা সাহিত্য মাটী হইল,—এইরূপ এবং আরও অনেকরূপ ধূয়া ধরিয়া কোন কোন পণ্ডিত আপন বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। নির্ভীক বঙ্কিম কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। স্থির লক্ষ্যে আপন গন্তব্য-পথে চলিতে লাগিলেন।

প্রতিভার আলোক সকলে সহিতে পারে না। যখনই যে

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত "বঙ্কিমচন্দ্র"—সাধনা।

সমাজে কোন প্রতিভাবান্ ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, তখনই সেই সমাজের জন-সাধারণের মধ্যে প্রথমতঃ একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ 'এই লোকটা আমাদের চেয়ে কিসে বড়',—তাহার বাদানুবাদ হয়। অন্যকে ছোট করিতে পারিলেই যেন তাহারা বড় হইল! কিন্তু কালের তুল্য বিশিষ্ট সমালোচক আর কেহ নাই। কাল, কিছু কাল পরে সেই জন-সাধারণের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেয়, কি গুণে সেই প্রতিভাবান্ ব্যক্তি সকলের বড়। তখন, সেই জন-সাধারণ, যে মুখে বিষ-বহ্নি উদ্গীরণ করিত, সেই মুখে অমৃতময় স্তুতিবাদের লহরী লইয়া সেই মহাপুরুষের পাদপদ্মে পুষ্প-চন্দন অর্পণ করিতে থাকে। বঙ্কিম, নিজ জীবনেই এই স্তুতিনিন্দার চরম-সীমায় উন্নীত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে সত্যের জয়ই বিঘোষিত হইল। প্রতিভা পূর্ণরূপে আপন আধিপত্য স্থাপন করিল।

এতদিনে বাঙ্গালীর গৌরবের ধন "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হইল।

৪

এইবার নদীতে কূলপ্লাবী তরঙ্গ উঠিল। স্রোতস্বতী কুলুকুলু রবে সাগরাভিমুখে ছুটিল।

সাহিত্য-কাননে মধুর বসন্তের সমাগম হইল। নানা-জাতীয় নয়ন-তৃপ্তিকর, অতি মনোহর, মধুগন্ধময় ফুলদল বিকশিত হইতে লাগিল। মৃদুমন্দ মলয়-মারুত-হিল্লোলে, কোকিলের কুহুতানে, ভ্রমরগুঞ্জনে, পাদতল-বিধৌত তটিনীর গানে,—প্রকৃতি হাস্যময়ী হইল,— জড়জগৎ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে চাঁদের হাসি, চকোর চকোরীর সেই চন্দ্র-সুধাপান, ভাবুকের সেই আত্মবিস্মৃতি,—সকলই মনোহর। কর্ম্মযোগী বঙ্কিম এইবার সত্য সত্যই বঙ্গ-সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিলেন।

'বঙ্গদর্শন' বাঙ্গালীর গৌরব, জাতীয় সাহিত্যের একমাত্র 'কোহিনুর'। যতদিন বঙ্গভাষা, ততদিন বঙ্গদর্শন।

সাহিত্য-রথী বঙ্কিম 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ করিয়াও কিছু-দিন প্রকৃতির অন্তরালে ছিলেন। ঠিক কাল পূর্ণ হইলে, ঋতুরাজ সদলবলে সাহিত্য-কাননে দেখা দিলেন। বন আলোকিত হইল। শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল। সুখ-বসন্তের আবি-র্ভাবে জীব-জগতের জড়ত্ব ঘুচিল।

কত ভাব, কত চিন্তা, কত উদ্যম, কত আশা, কত আলো, লইয়া বঙ্গদর্শন জড়প্রায় বাঙ্গালীর দ্বারে দ্বারে ফিরিল। এই ক্ষণ হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালীর জ্ঞানচক্ষু ফুটিল। ধর্ম্ম-প্রচারক ও নীতিবেত্তা 'পুলপিটে' দাঁড়াইয়া, গগন-ভেদী বক্তৃতা দিয়াও যাহা করিতে পারেন নাই, এক বঙ্গদর্শন তাহা সমাধা করিল। বাঙ্গালীর দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও কাব্য-সাহিত্য এইবার আপন পথ পাইল। নির্ভীকতা, তেজস্বিতা, সুদূরদর্শিতা ও সত্যবাদিতার গুণে বঙ্গদর্শন অতি অল্পকালের মধ্যেই শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্ত আকর্ষণ করিল।

ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষাকে সকলেই—বিশেষতঃ বিদ্বজ্জন-সমাজ অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। বঙ্কিম বাবু গভীর দুঃখে সে সকল কথা বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষার লেখক মাত্রেই হয়ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপি-কুশলতাশূন্য, হয়ত ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়ত অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরাজী গ্রন্থের ছায়া মাত্র; ইংরাজীতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি?"

দেখুন, তদানীন্তন সমাজের অবস্থা! এই অবস্থায় বঙ্কিমকে বাঙ্গালা ভাষার কাণ্ডারী হইতে হইয়াছিল! বিপুল মনোবলে বলীয়ান্ নির্ভীক বঙ্কিম,—তখন একমাত্র অদম্য উৎসাহে ও জীবন্ত বিশ্বাসে নির্ভর করিয়াই, সাহিত্য-সাগরে আপন

প্রতিভা-তরী ভাসাইলেন।—দুর্জ্জনে উপহাস করিল; ক্ষুদ্রচেতা টিটকারী দিল; অধমাত্মা বিফল-মনোরথ করিতে চেষ্টা পাইল;—ক্ষণজন্মা পুরুষসিংহ কিছুতেই বিচলিত হইলেন না,—কিছুতেই দৃক্‌পাত করিলেন না,—একাগ্রচিত্তে আপন লক্ষ্যপথে চলিতে লাগিলেন। শেষে প্রতিভারই জয় হইল।—লোকে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া বঙ্কিমের গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে লাগিল।

জীবনব্রত উদ্‌যাপিত করিয়াও বঙ্কিম তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। সর্ব্বপ্রকারে সাফল্যলাভ করিয়াও, জীবনের শেষদশায় তিনি অতি বিনীতভাবে এক স্থলে বলিয়াছেন,—"যেমন কুলি-মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা কান্তার মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম।" *

বাঙ্গালার একখানি প্রকৃত ইতিহাস লিখিবার সাধ বঙ্কিমের চিরদিন ছিল। কয়েকটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াও ছিলেন। কিন্তু আশানুরূপ সন্তোষলাভ করিতে পারেন নাই। তাই তিনি গভীর দুঃখে ঐ কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।—কে বলে, বঙ্কিম বাবু অহঙ্কারী ছিলেন? সর্ব্ব-বিষয়েই শক্তিশালী হইয়াও তবে কেন তিনি এত বিনয়ের পরিচয় দিবেন?—"বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারীর ফল, এই কয়েকটী প্রবন্ধ। বলিতে পারিনা যে, ইহার দর বেশী। দর বেশী হউক বা কম হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিদ্র, সে সোণারূপা জুটাইতে পারিল

* বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৯২।

না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না? বাঙ্গালীতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহা লিখুক না কেন,—সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। কিন্তু কৈ, আমি ত কুলি-মজুরের কাজ করিয়াছি,—এ পথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমন-বার্ত্তা ত শুনিলাম না?"

স্বদেশভক্ত, মায়ের সুসন্তান, বিনীত বঙ্কিমের এই উক্তি,—আজিকার ঐতিহাসিকগণের ভাবিবার বিষয়।

কিন্তু তথাপি, তাঁহার "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার," "বঙ্গদেশের কৃষক," "ভারত-কলঙ্ক" ও "বাঙ্গালার কলঙ্ক" প্রভৃতি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ,—গভীর চিন্তা ও অনুসন্ধানের ফল। বঙ্গদর্শনেই তাঁহার এই সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কেবলমাত্র "বাঙ্গালার কলঙ্ক" শীর্ষক প্রবন্ধটি "প্রচার" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

বঙ্গদর্শনের সৃষ্টি হইতেই বাঙ্গালী ভাবিতে শিখিল। তাহার চক্ষের ঠুলি খুলিল; দেখিল, চারিদিক অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা, মনস্বী যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের দর্শন, পণ্ডিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নানাবিষয়িণী চিন্তা, সূক্ষ্মদর্শী ভাবুক ও চিন্তাশীল সমালোচক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের অক্ষয়ভাষা ও "গ্রাবু" "দশমহাবিদ্যা" প্রভৃতি প্রবন্ধ, সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের বিবিধ রচনা, ডাক্তার রামদাস সেনের প্রত্নতত্ত্ব,স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত", দীনবন্ধুর সরস রসিকতা, নবীনচন্দ্রের নবীন পদ্য, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রভৃতির সাহায্যে,—বঙ্কিম অজেয় বলবিক্রমে সাহিত্য-রাজ্য সংস্থাপিত করিলেন, এবং অতি অল্প

কালের মধ্যেই স্বয়ং সেই রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া দেশীয় বিদেশীয় সকল শ্রেণীর লোককে চমৎকৃত করিলেন। তিনি আত্মবলে, লেখক হইয়াও সমালোচকের সিংহাসনে আসীন হইলেন। সমালোচনায়ও তিনি অপূর্ব্ব শক্তিমত্তার পরিচয় দেন। তিনি এক হস্তে পুষ্পমাল্য ও অন্য হস্তে সম্মার্জ্জনী লইয়া সমালোচকের পবিত্র আসন গ্রহণ করিলেন। সাহিত্য-সমাজে রাজার ন্যায় তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইল। নবীন লেখকগণ, সত্য সত্যই তাঁহাকে রাজার ন্যায় সম্মান ও ভয় করিয়া চলিতে লাগিলেন। বঙ্কিমের এক ছত্র প্রশংসা বা এক ছত্র নিন্দার মূল্য তখন অনেক ছিল।

প্রকৃত প্রতিভার নিকট সকলকেই অবনতমস্তক হইতে হয়। এই সময় হইতে বঙ্কিমের যশঃসৌরভ চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা প্রকাশ্যভাবে তাঁহার সহিত শত্রুতাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, এই সময় হইতে তাঁহারাও অল্পে অল্পে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে, নিম্নশ্রেণীর অপকৃষ্ট লেখক-সম্প্রদায় ব্যাঘ্রতাড়িত মেষপালের ন্যায় কে কোথায় উধাও হইয়া গেল। তাই বঙ্গসাহিত্যে তখন তেমন কণ্টক-আবর্জ্জনা প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। কচিৎ-কদাচিৎ যে দুই একখানা অসার গ্রন্থ প্রকাশ হইত, তাহাও শেষে “অগ্নি-পরীক্ষার” ভয়ে দূর হইতে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিত!

ন্যায়ের কঠোর দণ্ড এই এক দিকে যেমন, অন্যদিকে আবার গুণবান্ গ্রন্থকারও, গুণের পুরস্কার ততোধিক প্রীতিভরে পাইতেন। বঙ্কিম বাবু তাঁহার কোন সাহিত্য-বন্ধুকে এই কথা

বলিয়াছিলেন,—"বাঙ্গালার এই শিশুকাল, সমালোচনায়ও আমি খুব কঠোর বটে ;—কিন্তু যেখানে প্রতিভা বা মৌলিকতার একটুমাত্রও গন্ধ পাই,—সেখানে আমি লেখককে কোল দিই। তবে যাহাদের কস্মিন্‌কালে কিছু হইবে না,—সুতরাং এ পথও যাহাদের নয় বুঝিতে পারি, তাহাদিগকে অকারণ প্রশ্রয় দিই কেন ?—গোড়ায় 'জড়' না মারিলে অতঃপর উহাদিগকে আঁটিয়া উঠা ভার হইবে।"

বস্তুতঃ কথাটা বড় খাঁটী। সাহিত্য যে, সাধনার ধন ; সাহিত্যসেবী হওয়া যে, প্রকৃতিদত্ত একটা অধিকার-সাপেক্ষ ; দুর্ভাগ্যবশতঃ, তাহা অনেকেই ভাবিয়া দেখেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় ইহা সীমাবদ্ধ নহে। অগাধ পড়াশুনা থাকিলেও ইহা আয়ত্ত হয় না।—সাহিত্য-ধনে ধনী হইতে হইলে সাধনা চাই,—চিন্তা করিবার শক্তি চাই,—সূক্ষ্মদৃষ্টি চাই,—মানব-চরিত্রে অভিজ্ঞ হওয়া চাই,—সংসারের প্রত্যেক বস্তু তন্ন তন্ন করিয়া দেখা চাই।—সর্ব্বোপরি ভগবানের কৃপালাভের আবশ্যক করে।—ইহা ব্যতীত অবস্থা ও সময়ের তারতম্য বুঝিতে হইবে,—সার্ব্বজনীন সহানুভূতি হৃদয়ে পোষণ করিতে হইবে,—মনকে বড় ও তীক্ষ্ণ অনুভবক্ষম করিয়া উদার হইতে হইবে,—আরও অনেক সদ্‌গুণ লাভ করার আবশ্যক হইবে। তুমি এম্, এ উপাধিধারী বা রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তিভোগী ইংরেজী-অভিজ্ঞ সুপণ্ডিত ;—তুমি একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক হইতে পার ; তুমি বি, এল্ বা ডি, এল্ উপাধিধারী আইনজ্ঞ পুরুষ,—তুমি একজন সমজদার ব্যবহারাজীব হইতে পার ; কিন্তু তুমি যে, অতি অবশ্যই সুনিশ্চিতরূপে সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা বা একজন

সুদক্ষ লেখক হইবে, এমন কোন কথা নাই। —সে হিসাবে হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিহীন,—সামান্য লেখাপড়া-জানা ব্যক্তিও ভগবানের কৃপা ও সাধনাবলে,—চিন্তা,মৌলিকতা ও জীবনব্যাপী অধ্যবসায় বলে,—সাহিত্যে হয়ত তোমাপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্টতর সৃষ্টিচাতুর্য্য দেখাইতে পারেন। তর্কের খাতিরে এ কথা তুলিতেছি না, -ইহা স্বতঃসিদ্ধ এবং স্থলবিশেষে পরীক্ষিত। বস্তুতঃ লেখকের ধাত একটু স্বতন্ত্র রকমের হওয়া চাই। সাধারণ সংসারী লোকের মত তাঁহার ধাত হইলে, তাঁহার লেখার ধাতও কতকটা পান্‌সে রকমের হইবে। খাঁটি সাহিত্য সম্বন্ধে এই কথা। তবে বৈষয়িক কাজ-কর্ম্ম চালাইবার উপযোগী ও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের যোগ্য যে, কড়াক্রান্তি-হিসাব-নিকাশ-বিশিষ্ট স্থূল সাহিত্য বা "রোকা খাতা",—তাহার কথা স্বতন্ত্র। অবস্থা বিশেষে, সে সম্বন্ধে প্রায় সকলের অধিকার আছে। তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বঙ্কিম,—এ তত্ত্বটি বুঝিতেন। তাই তিনি ফাঁকা আওয়াজে বা বাহ্য চটকে ভুলিতেন না;—একটুমাত্র প্রতিভা বা মৌলিকতা না থাকিলে, কোন লেখককেই তিনি বড় একটা আমল দিতেন না।

সাহিত্যের প্রতি এইরূপ সম্মান,—সত্য ও ন্যায়ের প্রতি এইরূপ মর্য্যাদা-জ্ঞান,—এবং প্রকৃত শক্তিমত্তা, গুণগ্রাহিতা ও আন্তরিকতা যদি বঙ্কিমে না থাকিত, তবে বঙ্গসাহিত্যের অবস্থা আজ কি হইত বলা যায় না, এবং বঙ্গদর্শনও সাহিত্যভাণ্ডারে এত রত্ন রাখিয়া যাইতে পারিত কি না, ঘোর সন্দেহ। কারণ সমালোচনার উৎকৃষ্টতা,—বঙ্গদর্শনের একটি বিশিষ্ট গৌরব। সুযোগ্য, সম্ভ্রান্ত ও ন্যায়পর সমালোচক না হইলে, লেখক তাঁহার

নিকট মাথা নোঙাইবে কেন? যাহাকে দেখিয়া ভয়, ভক্তি ও সম্মানোদ্রেক না হইবে, তাঁহার কথা লোকে মানিবে কেন? আজিকার দিনে সাহিত্যের ভিতর যে, এত কণ্টক-আবর্জ্জনা জন্মিয়াছে ও জন্মিতেছে, তাহার প্রধান কারণ—প্রকৃত সমালোচ-কের অভাব,—বঙ্কিমের ন্যায় শক্তিশালী সমালোচকের অভাব। সমালোচকরূপ দক্ষ মালীর অভাবে, বঙ্গদর্শনের অনুষ্ঠিত বঙ্গ-সাহিত্যের সেই "সাজান বাগান" শুকাইয়া যাইতেছে। কেহ কাহাকে মানে না,—সম্ভ্রম-ভয়-সঙ্কোচ বা ভক্তির চক্ষে কেহ কাহাকে দেখেও না। তাই সুকুমার সাহিত্য-কাননে আগাছা-কুগাছা কণ্টক-আবর্জ্জনার এত বাড়াবাড়ি হইয়াছে যে, অনেক কষ্ট করিয়া, অনেক বেগ পাইয়া, পায়ে কাঁটা-ফোটার যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিলে, তবে এক আধটি ভাল ফুল তুলিতে পারা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত অক্ষয়চন্দ্রেরও,—বঙ্গদর্শনের এই সমালোচনায় কৃতিত্ব ছিল। সূক্ষ্মদর্শী অক্ষয়চন্দ্রও বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত বঙ্গদর্শনে বহুগ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন।

বঙ্কিম বাবুর সহিত এই প্রবন্ধ-লেখকের একদিন সমালোচন-সম্বন্ধে একটু কথাবার্ত্তা হয়। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন,—"যদি সাহিত্যের যথার্থ উপকার করিতে চাও, তবে প্রকৃত সমালোচনা করিতে সুরু কর,—ইহাতে তোমার ঐ * * * মাসিক পত্রিকাও বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিবে।"

সমালোচনার গুরুত্ব সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর নিজের এই মত।

"উত্তর-চরিতের" সমালোচনার পূর্ব্বে, বিস্তৃত সমালোচনা

কিরূপে করিতে হয়, বাঙ্গালী তাহা জানিত না ;—বঙ্গদর্শনই প্রথম সেই পথ দেখাইল। তারপর প্রসিদ্ধ সমালোচক সুধী চন্দ্রনাথ বসু,—ঐ বঙ্গদর্শনে, সঞ্জীব বাবুর আমলে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলের' সুন্দর সমালোচনা করিয়া,—ঐ গ্রন্থের নাটকত্ব দেখাইয়া, বিদ্বজ্জন-সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন।

বঙ্কিমের এই সমালোচন-শক্তি,—বঙ্কিমের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অন্যতম নিদর্শন।

বঙ্কিমের কি তদানীন্তন সাহিত্য-শিষ্য এবং সহচরগণ,—কি ইদানীন্তন অভ্যুত্থানশীল লেখক-সম্প্রদায়,—সকলেই বঙ্কিমের আলোকে অল্পাধিক আলোকিত। আজিকার দিনে সাহিত্যে এই যে আধ্যাত্মিকতার প্রাদুর্ভাব, ইহার মূলও সেই বঙ্গদর্শন। বঙ্গদর্শনই প্রথমে আর্য্যশাস্ত্রের অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ বিচার-বিশ্লেষণ করেন। এত চিন্তা ও গবেষণা, প্রবন্ধের এত বৈচিত্র্য ও মৌলিকত্ব, এবং এমন সুন্দর রচনা-প্রণালী ও লিপি-কুশলতা,—এখনকার দিনে আর কোন মাসিকপত্রে দেখিতে পাই না। তখন, এক বঙ্কিমই যে, 'একা এক-শ' ছিলেন। এক দিকে তাঁহার যেমন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, প্রখর অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর চিন্তাশীলতা, অন্য দিকে আবার তেমনই স্বাভাবিক ও সরস রঙ্গরস এবং হাস্য-কৌতুক-বিদ্রূপ। আবার তাহা প্রকাশের ভাষাই বা কিরূপ!—সরল, প্রাঞ্জল, মধুর ও মর্ম্মস্পর্শিনী। তা কি বিজ্ঞান, কি দর্শন ; কি ইতিহাস, কি প্রত্নতত্ত্ব ; কি ধর্ম্ম, কি সাহিত্য ; কি সমালোচন, কি উপন্যাস ;—সে 'ভাবমন্দাকিনী', মর্ম্মস্পর্শিনী কবিত্বময়ী ভাষার ও সে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার কি তুলনা আছে? আবার যখন সেই ক্ষিপ্ত "কমলাকান্ত" অতি মিষ্ট, অতি

কোমল, অতি করুণ,—অথচ ঈষৎ হাসি-কান্নার সুরে বাঁশরী বাজাইয়া বাঙ্গালী নরনারীকে এক দিন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল, এবং যে গানের সুরে সুর মিলাইয়া শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় একমাত্র "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" লিখিয়া ধন্য হইয়াছেন,—বঙ্কিমের সে ভাষার তুলনা কোথায়?

প্রথম চারি বৎসর অতি দক্ষতার সহিত "বঙ্গদর্শনের" সম্পাদন-কার্য্য করিয়া, বঙ্কিম বঙ্গবাসীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর সঞ্জীব বাবু বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হন। বঙ্কিম বাবু তখনও ইহাতে নিয়মিতরূপে লিখিতে লাগিলেন। তখনও তাঁহার অনেক উপন্যাস, ছোট গল্প ও প্রবন্ধাবলী ইহাতে প্রকাশিত হইল। এই সময়ে ৺চন্দ্রনাথ বসু, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত, ঔপন্যাসিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, চিন্তাশীল পূর্ণচন্দ্র বসু এবং সুধী তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক নবীন ও প্রবীণ লেখক বঙ্গদর্শনে লিখিতে আরম্ভ করিলেন,—যাঁহাদের যশঃ-সৌরভে আজ বঙ্গদেশ আমোদিত।

কিন্তু ক্রমেই বঙ্গদর্শন হীনপ্রভ হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া, সঞ্জীব বাবুও কাগজ বন্ধ করিয়া দিলেন।

দূরদর্শী বঙ্কিম কিন্তু সাহিত্যের গতি বুঝিয়া, দিন থাকিতে, খুব সম্মানের সহিত বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় দায়িত্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। "বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ" উপলক্ষে তিনি যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও কত মূল্যবান্! তিনি বলিয়াছিলেন,—'যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ হয়, তখন সাধারণের পাঠযোগ্য অথচ উত্তম সাময়িক-পত্রের অভাব

ছিল। এক্ষণে তাদৃশ সাময়িক পত্রের অভাব নাই। * * * আমার অপেক্ষা দক্ষতর ব্যক্তিগণ এই ভার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া, আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত এবং বঙ্গদর্শনের জন্য আমি যে শ্রম স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহা সার্থক বিবেচনা করি। * * * যখন আমি এই বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণ করি, তখন এমত সঙ্কল্প করি নাই যে, যতদিন বাঁচিব, এই বঙ্গদর্শনে আবদ্ধ থাকিব। ব্রতবিশেষ গ্রহণ করিয়া কেহই চিরদিন তাহাতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। * * * আমি একদিনের তরেও ব্যক্তি-বিশেষের আদর ও উৎসাহের কামনা করি নাই, কিন্তু সাধারণ পাঠকের এই উৎসাহ ও যত্ন না দেখিলে আমি এতদিন বঙ্গদর্শন রাখিতাম কিনা সন্দেহ। যে সকল সহযোগী বঙ্গদর্শনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমার শত শত ধন্যবাদ। ইহাতেও আমার একটু স্পর্দ্ধার কথা আছে। উচ্চ-শ্রেণীর দেশী সংবাদপত্র মাত্রই বঙ্গদর্শনের অনুকূল ছিলেন ; অধিকতর স্পর্দ্ধার কথা এই যে, নিম্নশ্রেণীর সংবাদপত্র মাত্রেই ইহার প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন। * * * চারি বৎসর হইল, বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জল-বুদ্‌বুদ্ বলিয়াছিলাম। আজি সেই জল-বুদ্‌বুদ্ জলে মিশাইল।”

কথাগুলি স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করিয়া রাখিবার যোগ্য। এই কয়ছত্র কথাতেই নির্ভীক ও তেজস্বী বঙ্কিমের হৃদয় কেমন পরিব্যক্ত হইয়াছে!—“অধিকতর স্পর্দ্ধার কথা এই যে, নিম্নশ্রেণীর সংবাদপত্র মাত্রই ইহার প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন।” এইরূপ তেজস্বিনী ও মর্ম্মস্পর্শিনী উক্তিকে, সাধারণ লোকে “অহঙ্কার” বলে! তাই, সাধারণের নিকট বঙ্কিম,—“অহঙ্কারী”

"দাম্ভিক" প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত হইতেন। বুদ্ধিমান্‌কে বলিতে হইবে না যে, ইহা অহঙ্কার বা দাম্ভিকতা নহে;—ইহা সরল, সত্যনিষ্ঠ ও তেজস্বী ব্যক্তির স্বভাব-ধর্ম্ম। জীবনে যেরূপ, সাহিত্যেও সেইরূপ উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিতে হয়। সরলতা, সত্যনিষ্ঠতা ও তেজস্বিতা, সাহিত্যের একটি প্রধান গুণ।—গুণবান্ বঙ্কিমকে, লোকে না বুঝিয়া, দাম্ভিক ও অহঙ্কারী বলিত।

এইবার প্রতিভার গতি আর এক পথে ছুটিল। প্রকৃতির প্রিয়পুত্র অতি উচ্চলক্ষ্যে আপন প্রতিভার গতি নিয়োজিত করিলেন। সাহিত্য, সমাজ, দেশ তাহাতে যে উচ্চশিক্ষা লাভ করিল, যথাস্থানে আমরা সে সকল কথার আলোচনা করিব।

৫

সাধারণের অপরিচিত, অতি দুর্গম, বিদ্বজ্জন-সমাজ-ঘৃণ্য,একটি নূতন পথে আসিয়া, প্রতিভা-বান্ বঙ্কিম আত্ম-প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিলেন। বিশিষ্ট ক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি তদানীন্তন হুজুগে মাতিলেন না।—যশঃ, সম্ভ্রম ও নামের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, সবটা মনঃ-প্রাণ এক করিয়া, তিনি বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবায় ব্রতী হইলেন। যদিও তরুণ-বয়সে তিনি মাইকেলের ন্যায় ইংরেজী-বিদ্যার পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে "Indian Field" নামক কাগজে, "Rajmohan's Wife" নামে একখানি ইংরেজী উপন্যাসের কিয়দংশ লিখিয়া-ছিলেন, কিন্তু অনতিবিলম্বে আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, অতি উচ্চলক্ষ্যে জীবনের গতি ফিরাইলেন।—হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ ও প্রেম দিয়া তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। অথচ ইংরেজীতে বঙ্কিম কিরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা মনস্বী হেষ্টির সহিত তাঁহার তর্কযুদ্ধে বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। হেষ্টি সাহেব স্পষ্টাক্ষরে এ কথা লিখিয়াছিলেন,—"এতদিনে আমি একজন প্রকৃত পণ্ডিতকে প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে পাইলাম।" বঙ্কিমের অনেক বিশিষ্ট শিষ্যের সহিত—দেশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিও তখন বিস্ময়ের সহিত বলিয়াছিলেন,—

"বঙ্কিমবাবুর বাঙ্গালা লেখা অধিক মিষ্ট, কি ইংরেজী লেখা অধিক মিষ্ট?" বল দেখি, চিরদিন ইংরেজী লেখার চর্চ্চা রাখিলে, বঙ্কিম একজন কত বড় ইংরেজীলেখক হইতে পারিতেন?

কিন্তু প্রতিভা ত শুধু নামের কাঙ্গাল নয়,—প্রতিভা কাজ চায়;—পৃথিবীতে কিছু নূতন জিনিষ দিবার আশা রাখে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সেই প্রতিভার ফল,—তদ্বিরচিত অতি অপূর্ব্ব ও অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী। বিশেষ উপন্যাসে বঙ্কিমের অসাধারণ—অদ্ভুত অধিকার। বঙ্গে এ বিষয়ে তিনি অদ্বিতীয়। উপন্যাসে বঙ্কিমের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার যোগ্য আজ পর্য্যন্ত কেহ হন নাই। বঙ্কিমের সেই বিশ্ববিশ্রুত উপন্যাসাবলীর নূতন পরিচয় আর কি দিব? আমার বোধ হয়, বঙ্কিমের ঠিক সমালোচনার দিন এখনও আসে নাই। তবে আমরা যাহা কিছু বলিয়াছি ও বলিব, তাহা কতকটা ভক্তির অভিব্যক্তি মাত্র। কবির ভাষায় বলি,—

"তোমারি চরণ, করিয়ে স্মরণ,
চ'লেছি তোমারি পথে।
তোমারি ভাবেতে দেখিব তোমারে
ধরি এই মনোরথে॥"

"দুর্গেশনন্দিনী"র পূর্ব্বে, বাল্যকালে বঙ্কিম 'ললিতা" ও "মানস" নামে দুইটি পদ্যময় গল্প লিখেন এবং পঠদ্দশায় একটি পুরস্কার-প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। তখন কলিকাতার কোন সাহিত্যসভা এইরূপ প্রতিযোগী-পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন। পরী-

ক্ষায় বঙ্কিম অনুত্তীর্ণ হন;—ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র উত্তীর্ণ হইয়া পুরস্কার পান। পরন্তু এক্ষণে উভয়েরই সে প্রবন্ধের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে।

দুর্গেশনন্দিনীতে বঙ্কিম যশোলাভ করিতে পারেন নাই,—বরং তদানীন্তন সাহিত্য-সমাজ তাঁহাকে যথেষ্ট পরিমাণে নিরুৎসাহিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। পত্র-সম্পাদকগণ প্রায় সকলেই একবাক্যে দুর্গেশনন্দিনীর নিন্দা করিয়াছিলেন;—দুই এক খানি কাগজ প্রশংসা করিয়াছিল মাত্র।

এক্ষণে দুর্গেশনন্দিনীকেই আমরা বঙ্কিমের সর্ব্বপ্রথম পুস্তক,—বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস বলিয়া গণ্য করিব। অবশ্য ভূদেব বাবুর "ঐতিহাসিক উপন্যাস" ও প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল" তৎপূর্ব্বে বিরচিত;—সে হিসাবে এই দুই গ্রন্থই বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস;—কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে "দুর্গেশনন্দিনী" হইতেই বাঙ্গালায় প্রকৃত উপন্যাসের সৃষ্টি হয়। ইহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি না হইলেও গদ্যসাহিত্যে স্বাধীন চিন্তা, সরস রসিকতা, কবিত্ব এবং জাতীয় ভাব এই প্রথম প্রবেশ করিল। সূক্ষ্মদর্শী বঙ্কিম বুঝিলেন, সরস গল্প গুছাইয়া বলিতে পারিলে সহজেই লোক আকৃষ্ট হয়। তাই তিনি প্রধানতঃ পাঠক জুটাইবার উদ্দেশ্যে,—বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা পড়াইবার অভিলাষে,—তাঁহার সেই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা উপন্যাসে নিয়োজিত করিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার সেই মহদুদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছে। এক্ষণে যে, বাঙ্গালা সাহিত্যে নানা শ্রেণীর নানা গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে,—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনবৃত্ত, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়েই

কোন না কোন গ্রন্থ দেখা যাইতেছে,—ইহার মূল বঙ্কিম। বঙ্কিমই প্রথম শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রচার করিয়া,--রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ইংরেজ যে,এখন বাঙ্গালা সাহিত্যের একটু খোঁজ-খবর রাখেন,—ইহার মূলেও বঙ্কিম। প্রকৃত প্রস্তাবে, ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা না চলিত,—বাঙ্গালা সাহিত্য যদি একমাত্র সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত হইত, তাহা-হইলে ইহার এরূপ পুষ্টি ও প্রচার কখনই সম্ভবপর হইত না। অতিরিক্ত বিজ্ঞতা ও সহজসুলভ মুরব্বিয়ানাটুকু ছাড়িয়া দিয়া, একটু ধীরভাবে উদারচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়, মাত্র ৫০।৬০ বৎসরে একটা পরাধীন জাতির মধ্যে ভাষার কি অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে! এখন কোন কোন মহানুভব ইংরেজও যত্নপূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষা শিখিয়া থাকেন, এবং কেহ কেহ উত্তমরূপ বাঙ্গালা শিখিয়াওছেন।—বাঙ্গালা কোন কোন গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদিতও হইয়াছে।——যখন রাজার জাতি ইংরেজ,—মাৎসর্য্য অহমিকা ত্যাগ করিয়া, বাঙ্গালা শিখিতে,—বাঙ্গালার ভাব ও চিন্তা উপলব্ধি করিতে এবং বাঙ্গালার কাব্যরসের আস্বাদন লইতে উদ্‌গ্রীব,—তখন যে বাঙ্গালা ভাষার কিছুমাত্র উন্নতি বা শক্তি-সঞ্চার হয় নাই,—বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষার আলোচনা করিতে বসিয়া, এ কথা কিরূপে স্বীকার করি? যাই হোক্, এ সকলের মূল বঙ্কিম। বঙ্কিম বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে না নামিলে,—বঙ্কিমের ন্যায় শক্তিশালী পুরুষ বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা না করিলে, বাঙ্গালা সাহিত্য আজ কখনই রাজা-প্রজা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না;—বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায়ও

বাঙ্গালা সাহিত্য স্থানলাভ করিতে পারিত না।* সুতরাং সত্যের অনুরোধে মুক্তকণ্ঠে বলিতে হয়,—বঙ্কিমের নিকট বাঙ্গালা দেশ কৃতজ্ঞ,—সমগ্র বাঙ্গালী জাতি কৃতজ্ঞ। অন্ততঃ কৃতজ্ঞ হওয়াই কর্ত্তব্য ও স্বাভাবিক। অবশ্য বঙ্কিমের লেখা যে, সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এবং উহাই সাহিত্যের চরম,—এমন কথা বলিতেছি না। গুণ থাকিলে যে, দোষ থাকিবে না, এমন কোনও কথা নাই। পরন্তু গুণের তুলনায় দোষের ভাগ,—বঙ্কিমের লেখায় খুবই কম। সে কমও যাঁহারা বুদ্ধিদোষে বা ঈর্ষাবশে অত্যধিক মাত্রায় পরিণত করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত বা কৃপার পাত্র;—এই সিদ্ধান্ত ভিন্ন উপস্থিত সময়ে বঙ্কিম-ভক্তগণের আর কোন সান্ত্বনা নাই।

তর্কের খাতিরে বঙ্কিমের "ধর্ম্মতত্ত্ব" বা অন্যান্য গ্রন্থ বাদ দিয়া, কেবলমাত্র বঙ্কিমের উপন্যাস-গ্রন্থ লইয়া বিচার করিলেও বঙ্কিমের অসাধারণ প্রতিভা ও মনস্বিতায় মুগ্ধ হইতে হয়। বঙ্কিমের উপন্যাস কিরূপ মনোজ্ঞ, সমগ্র বাঙ্গালা দেশ এবং কোন কোন পাশ্চাত্য প্রদেশ তাহার সাক্ষী।—জর্জ্জ ইলিয়েটের গভীর ভাব ও লিপিকুশলতা, ভিক্টর হিউগোর সূক্ষ্মদৃষ্টি ও মানব-চরিত্রে অভিজ্ঞতা, ডিকেন্সের সরস ও মর্ম্মস্পর্শী রসিকতা, এবং স্কটের বৈচিত্র্যময় কবিত্বপূর্ণ আখ্যান-প্রণালী,—এই চারি জনের এই চারি প্রকারের কিছু কিছু বঙ্কিমের মধ্যে দেখিতে পাওয়া

---

* পূর্ব্বে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা সাহিত্য "দ্বিতীয় ভাষা" (Second Language) স্বরূপ গৃহীত হইত, তাহা নাম মাত্র।—তাহা পরীক্ষার্থী বা পরীক্ষকদিগের আদর ও শ্রদ্ধার বস্তু ছিল না। বাঙ্গালা তখন যেন একটা সংএর সামগ্রী ছিল। এখন আর সেদিন নাই;—এখন পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষক—উভয়েই বাঙ্গালা ভাষাকে সম্মানের চক্ষে দেখেন।

যায়,—অর্থাৎ এই চারি জনেরই অধিকাংশ গুণ এক বঙ্কিমেই আছে।—সুতরাং উপন্যাস-জগতে আমাদের বঙ্কিম রাজ-রাজেশ্বর!

বঙ্কিমের এই উপন্যাসের ভাষার সহিত আমাদের দেশের 'কথকথা'র তুলনা করিতে পারি। কথক যেমন মধুর কীর্ত্তনাঙ্গে অল্পেই শ্রোতাকে মোহিত করেন,— বঙ্কিমের ভাষাও সেইরূপ সমজদার ও অসমজদার,—পণ্ডিত ও মূর্খ,—উভয় শ্রেণীর পাঠক-কেই অতি সহজে আকৃষ্ট করিতে পারে। তাঁহার ভাষায় বুঝি কিছু মাদকতা বা নেশা আছে, যাহা পাঠে,—যাহার রস আস্বা-দনে পাঠককে তন্ময় হইতে হয়! তাই বলেতেছি, ভাষাকে লইয়া ক্রীড়া-পুত্তলের মত,—যখন যেমন ইচ্ছা—তখন সেই মত ব্যবহার করিতে, এক বঙ্কিম ভিন্ন ইতঃপূর্ব্বে আর কেহ সমর্থ হন নাই।

শুনিয়াছি,—কোন একখানি পার্শীগ্রন্থে একটি গল্প আছে কোন এক লেখকের ভাষার উপর প্রবল আধিপত্য জন্মিয়াছিল। ভাষা যেন লেখকের আজ্ঞাকারিণী কিঙ্করী হইয়াছিল। সেই লেখক আত্ম-জীবনবৃত্তে লিখিতেছেন,—"আমি যখন লিখিতে বসি, তখন যেন আমায় চারিদেকে অপ্সরানৃত্য হইতে থাকে। নর্ত্তকীগণের মনোহর বেশ, মনোহর মূর্ত্তি, মনোহর অঙ্গভঙ্গী। তাহারা নৃত্য করিতে করিতে সা উপযাচিকা হইয়া যেন বলিতে থাকে,—'আমাকে গ্রহণ কর,—আমাকে গ্রহণ কর।'—সত্য সত্যই ভাষা তখন আমার আজ্ঞাকারিণী কিঙ্করী হয়।—তখন আমি যাহা ভাবি, আমার কলমের মুখে, তাহাই আসে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষা সম্বন্ধেও এই কথা খানিকটা খাটে।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বলেন,—"আলালী" বা "সাগরী" ভাষা অবলম্বনে বঙ্কিম বাবুর ভাষা গঠিত হয় নাই,—সুপণ্ডিত ৺ রামকমল ভট্টাচার্য্যের "দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ" নামক গ্রন্থের ভাষার ছাঁচ লইয়া বঙ্কিম বাবুর ভাষা গঠিত।" প্রমাণস্বরূপ, 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে, 'পিতাপুত্র' নামক প্রবন্ধে তিনি উক্ত ভাষার নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। ভাষাতাগী সুধীমণ্ডলীর কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য আমরা তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"আমাদিগের জাহাজে সপ্তদশবর্ষবয়স্কা এক ফরাশি যুবতী ছিলেন। তাঁহার নাম জুলিয়া;—তাঁহার স্বামীও এই জাহাজে ছিলেন। স্বামীর বয়ঃক্রম চল্লিশ বর্ষের ন্যূন ছিল না। বুঝিতেই পার, এমন স্ত্রীর এমন স্বামীর প্রতি কেমন অনুরাগ হয়। জুলিয়া দেখিতে অতি সুরূপা। তাহার অলকগুলি কুঞ্চিত হইয়া এরূপ মধুরভাবে কপোলদেশে পতিত হইত যে, দেখিলে মোহিত হইতে হয়। নয়নযুগল উজ্জ্বল, বিশাল ও ভ্রমরের ন্যায় নীল। কপোলতল এরূপ স্বচ্ছ যে, মুখ দেখা যায়। আমি দেখিয়া অবধি যুবাজনসুলভ ভাবের অনধীন থাকি নাই। জুলিয়ার স্বামী আমার নবীন বয়স ও নির্ভয় ব্যবহার দেখিয়া অবশ্যই উদ্বিগ্ন এবং কোন বিষম ঘটনার শঙ্কায় জড়ীভূত থাকিতেন। তিনি আমার প্রতি অতি অপরিচিত ভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তথাপি তাঁহার পত্নীর সহিত আমার সাক্ষাৎকার বা কথোপকথন স্পষ্টরূপে নিষেধ করিতে

পারেন নাই। ইউরোপের প্রথা, এ দেশের মত, যুবতী পরপুরুষের সহিত আলাপ করিতে নিষেধ করে না। অতএব আমি জুলিয়ার প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে বিমুখ হই নাই। এইরূপে আমাদিগের পথ অতীত হইতে লাগিল। কোন দিন একটি হাঙ্গর, কোন দিন জগন্নাথের মন্দিরের চূড়া, কোনদিন মছলী বন্দরে মাস্তুলের বন, কোনদিন সাফা উর্ম্মিমালায় আহত উপকূলে অধিষ্ঠিত মান্দ্রাজ নগরের প্রাসাদাগ্র—এই সকল দেখিতে দেখিতে আমরা বঙ্গোপসাগরের নীল জল ভেদ করিয়া যাইতে লাগিলাম।"

বস্তুতঃ,অক্ষয় বাবুর এই উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিয়া আমরা কিছু বিস্মিত হইয়াছি। আমাদের চিরদিনের সংস্কার যেন একটা নূতন আলোক দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছে। কেননা, একরূপ বাল্যকাল হইতেই আমরা শুনিয়া আসিতেছি, 'সাগরী' ও 'আলালী' ভাষার ছাঁচ লইয়াই বঙ্কিম বাবুর ভাষা গঠিত; কিন্তু অক্ষয় বাবুর এই অভিনব গবেষণার ফল দেখিয়া, তাঁহার অকাট্য প্রমাণ উপলব্ধি করিয়া, হয়ত আমাদিগকে পূর্ব্ব মত বদ্‌লাইতে হইবে। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, রামকমলের "দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ"ই বঙ্কিম বাবুর ভাষার আদর্শ। ভাষাতত্ত্ববিদ্ সুধীমণ্ডলীরও এ কথা বিশেষ ভাবিবার বিষয়।

এখন যাহা বলিতেছিলাম ;—

যাঁহাদের ধারণা, সরল ও সরস ভাষায় ভাবের গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয়,—অধিকন্তু শব্দ-সম্পদের অভাবে ভাষার ভাণ্ডার শূন্য হইয়া পড়ে, তাঁহাদিগকে, বঙ্কিমের উপন্যাসাবলী একটু বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িতে অনুরোধ করি। হেলায়-তাচ্ছিল্যে

পড়িলে হইবে না,—একটু শ্রদ্ধার সহিত পড়িতে অনুরোধ করি। কারণ, হাসি-মস্‌করার সহিত অবজ্ঞাভাবে বই পড়িলে,—অন্যে পরে কা কথা, —স্বয়ং বেদব্যাসও হারি মানেন! অতএব,বঙ্কিমের উপর যাঁহাদের "নিষ্কাম" রাগ, ঘৃণা বা আরও কিছু আছে, করযোড়ে তাঁহাদের প্রতি নিবেদন, এই প্রবন্ধ-পাঠের পূর্ব্বে, বঙ্কিমের যে কোন একখানি বই, ভাল করিয়া পড়িবেন। তাহা হইলে, বঙ্কিমের সহিত এই প্রবন্ধ-লেখককেও আর "জাহান্নবে" যাইতে হইবে না। কারণ, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যে, সকল কথার আলোচনা করিতে পারি, এমন সময়ও নাই এবং শক্তিও নাই।

আর এক কথা;—"উপন্যাস বা গল্পের বই,—ও তো মেয়েলি-কথা;—স্ত্রীলোকে ও বালকেই উহা পড়ে;—উহা পড়িয়া আর সময় নষ্ট করি কেন,—এবং আত্মাবমাননাই বা স্বীকার করি কেন?"—ইত্যাকার এবং আরও অনেক প্রকার মুরুব্বিয়ানার ধুয়া ধরিয়া যাঁহারা উপন্যাস-লেখকগণকে বড় বেশী তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন, তাঁহারা যদি মনটাকে একটু প্রশস্ত ও পবিত্র করিয়া, বঙ্কিমের একখানা উপন্যাস বা গল্পের বই পড়িয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন,—বিধি-সৃষ্টির অংশবিশেষ লইয়া, একটি ক্ষুদ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে মানবের জীবন-সমস্যা ব্যাখ্যা করা,—বড় সহজ কথা নহে। তবে বেঙ্গ-বেঙ্গমীর কথা, পক্ষিরাজ ঘোড়ার কথা, সুয়ো-দুয়োর কথা, আশ্চর্য্য প্রদীপের কথা প্রভৃতি পড়িয়া যাঁহারা বঙ্কিমের উপন্যাস বা গল্প ধারণা করেন,—তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের কোন কথা নাই। তা আসল কথাটা কি জান?—এ সকল সিদ্ধান্ত বা মত,—সাধারণ পাঠকমণ্ডলীর নহে,—কতকগুলি খোঁড়াইয়া-

বড় হইতে ইচ্ছুক, বিফল-মনোরথ লেখক মহাশয়ের!—তাঁহাদের লেখার যে একটুখানি শক্তি ছিল,তাহা আর এখন নাই;—সাহিত্যের বাজার হইতে তাঁহাদের দোকান-পাট উঠিয়াছে,—সেই মামুলি-মান্ধাতা-আমলের বাঁধা-গতে ও ফাঁকা-আওয়াজে আর কিছু হয় না,—বয়োঃজ্যেষ্ঠ এবং অনেক দিনের লেখক হইলেও পাঠক-সমাজে এখন আর তাঁহাদের তেমন প্রতিষ্ঠা নাই;—বঙ্কিমের উপন্যাস ত তবু স্ত্রীলোকে ও বালকে পড়ে;—তাঁহাদের পুস্তক উই ও ইঁদুর ভিন্ন আর কেহ ছোঁয় না;—কাজেই মহাত্মাদের যতটা "নিষ্কাম-রাগ ও অভিমান",—উপন্যাস-লেখকগণের গুরুস্থানীয় বঙ্কিমের উপরেই আসিয়া পড়ে।—তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া, একমাত্র 'দেশের মঙ্গলকামনায়', তাঁহারা সেই অতি-সতর্ক নীতিবেত্তা বৃদ্ধ "পলোনিয়াস্"-প্রকৃতি হন।—উপন্যাসে ও কাব্যে সদাই "নীতির খুঁৎ" বাহির করিতে থাকেন।—আর উপন্যাস বা কাব্য লেখা যে, কিছুই নয়,—এই কথাটা অনেক রকমে প্রমাণ করিতে তাঁহারা চেষ্টা পান।——ইঁহাদের সম্বন্ধে,—আর কি বলিব?

তবে, এক শ্রেণীর পাঠককে কিছু বলিবার আছে। যাঁহারা ভাবেন, উপন্যাস জিনিসটা খাস্ ইংরেজী হইতে গৃহীত, তাঁহারা একবার সংস্কৃত "দশকুমারচরিত" এবং বাণভট্ট-বিরচিত "কাদম্বরী" প্রভৃতির কথা ভাবিয়া দেখিবেন। দেখিবেন, সংস্কৃত-সাহিত্যেও বহু কাল হইতে উপন্যাস ও গল্পের প্রচলন আছে। আর এই যে ভারতের বিশালগ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারত,—পৌরাণিক ইতিবৃত্ত হইলেও,—ইহাতেও কি উপন্যাস এবং গল্প নাই? এই দুই গ্রন্থের বিশাল শাখাপ্রশাখা

—যে উপন্যাস ও গল্পময়, তাহা লেখা কি সহজ? এই রামায়ণ ও মহাভারত কি কেবলমাত্র স্ত্রীলোক ও বালকের পাঠ্য? না, রামায়ণ মহাভারতই জাতীয়জীবন গঠনের,—প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের প্রধান গ্রন্থ। চরিত্র ও ধর্ম্ম যেমন রামায়ণ মহাভারতে প্রদর্শিত হইয়াছে,—আধুনিক কোন্ নীতিবেত্তা দার্শনিক, ইতিবৃত্তলেখক, প্রত্নতত্ত্ববিদ্, প্রবন্ধকার এবং ইত্যাদি ইত্যাদি মহাশয়গণ তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আদর্শ দেখাইতে সক্ষম?

এ হিসাবে এখন বড় গলা করিয়া বলিতে পারি, বঙ্কিমের কোন্ উপন্যাসে ধর্ম্ম ও নীতির আদর্শ নাই? কোন্ উপন্যাস পাঠককে অধঃপাতে যাইতে উপদেশ দিতেছে? তবে বুদ্ধির দোষে বা প্রলোভন-বশে, যে উচ্ছিন্ন যাইবে,—সে শুধু বঙ্কিমের বই কেন,—রামায়ণ-মহাভারত পড়িয়াও ত যাইতে পারে?—আরও সহস্র উপায়েও ত গিয়া থাকে? তা' সেজন্য তোমার অত মাথাব্যথা কেন? বঙ্কিমকে বা তৎ-পদানুসরণকারী শিষ্যবৃন্দকে খাটো করাই যদি তোমার একমাত্র লক্ষ্য হয়, ত অত বিজ্ঞতার ভাণ কেন?—ভাবের ঘরে চুরি করিয়া, মনে মুখে অমন গোঁজামিল চালাইয়া, মানের কান্না কেন?

তাই বলিতেছিলাম, যদি যথার্থই বঙ্কিমকে পড়িয়া দোষ-গুণের বিচার করিতে হয়, স্বচ্ছন্দে কর; পরন্তু তৎসঙ্গে আত্ম-প্রবঞ্চনারূপ দুষ্ট-নীতি অবলম্বন করিয়া, মনে ভাল লাগা সত্ত্বেও মুখে মন্দ বলিয়া, মানীর মান হরণ করিও না। বঙ্কিমের মত অমন মিঠা-হাতে উপন্যাস বা গল্প লিখিবার ক্ষমতা থাকিলে, হয়ত তুমি আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিতে; পরন্তু বিধির বিধানে সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়াছ বলিয়া, ঈর্ষারূপ বিষ-বহ্নি

উদ্গীরণ পূর্ব্বক মনকে কলুষিত করিও না ;—"গুণ-চোর" হইয়া আপনার তথা সাহিত্যের ও দেশের সর্ব্বনাশসাধন করিও না।—ইহাই আমাদের অনুরোধ ও প্রার্থনা।

বলিয়া রাখা ভাল, এক শ্রেণীর পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি,—এখনও বঙ্কিমের নিন্দা,—বঙ্কিমের লেখার অসারত্ব প্রতিপন্ন করিতে পরাঙ্মুখ নহেন।

৬

বঙ্কিমের উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমের মানসিক উন্নতি ও প্রতিভার গতি কখন কোন্ পথে গিয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। প্রতিভার এই ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বঙ্কিমের জীবন বড় বৈচিত্র্যময়। অবশ্য সাধারণতঃ, তাঁহার উপন্যাসে তিনটি স্তর দেখিতে পাই। "দুর্গেশনন্দিনী", "মৃণালিনী", "কপালকুণ্ডলা", "রজনী" এবং "চন্দ্রশেখরের" ভিত্তি,—সুকুমার কাব্যের উপর স্থাপিত।—নায়ক-নায়িকার প্রেম এবং মুখ্যতঃ সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই ইহার মূলাধার। তার পর বঙ্কিমের দৃষ্টি,—হিন্দুর সংসারে ও সমাজে প্রবিষ্ট হইল। তাহার ফল তদ্বিরচিত—"বিষবৃক্ষ", "কৃষ্ণকান্তের উইল" ও "দেবী চৌধুরাণীর" কিয়দংশ। অতঃপর মনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমের স্বজাতিপ্রীতি, স্বদেশ-ভক্তি ও স্বধর্ম্মরক্ষার ভাব জাগিয়া উঠিল। তাহার ফল—"আনন্দমঠ", "দেবী চৌধুরাণী"র কিয়দংশ ও "সীতারাম"—এবং আর এক অংশে নূতন সংস্করণ "রাজসিংহ"। কিন্তু এই তিন স্তরেরই প্রথম ও প্রধান উপাদান—প্রেম। মানবহৃদয়ের অতি কোমল, অতি সূক্ষ্ম, অতি স্বাভাবিক ভাবটি অবলম্বন করিয়া বঙ্কিম বিবিধ প্রকারে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রেমের বৈচিত্র্য নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়াছেন। তাঁহার এই প্রেম—মানব-মানবীর

হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া, সেই চরম কেন্দ্রে—ভগবানে গিয়া পঁহুছিয়াছে।

কিন্তু এখানে একটি বিশেষ ভাবিবার বিষয় আছে। উপরে যে ভাবে আমরা বঙ্কিমের উপন্যাসের শ্রেণী-বিভাগ করিলাম, তাহা কিন্তু বঙ্কিমের ঠিক পর-পর লেখা নয়। নিম্নলিখিত সময়ে বঙ্কিমের নিম্নলিখিত উপন্যাসগুলি পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ;—

১২৭১ সালে—দুর্গেশনন্দিনী ; ১২৭৩ সালে—কপালকুণ্ডলা ; ১২৭৬ সালে—মৃণালিনী ; ১২৮৮ সালে—আনন্দমঠ ; ১২৯১ সালে—দেবী চৌধুরাণী ; ১২৯৩ সালে—সীতারাম ইত্যাদি।

ইংরেজী ১৮৭৯ সালে "বঙ্গদর্শনের" আবির্ভাব হয়। দুর্গেশ-নন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী ব্যতীত,—বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমের বাকী উপন্যাসগুলি,—কোনখানি সম্পূর্ণরূপে, কোনখানি অসম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। কেবলমাত্র "সীতারাম" খানি "প্রচারে" প্রকাশিত হইয়াছিল।

বঙ্কিমের ঐ প্রথম তিন খানি উপন্যাস,—দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী,—১২৭১ হইতে ১২৭৬ সাল মধ্যে লিখিত। ১২৪৫ সালে বঙ্কিম জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং ২৭ হইতে ৩২ বৎসর বয়সে,—ছয় বৎসরের মধ্যে,—তাঁহার ঐ তিন খানি গ্রন্থ রচিত হয়। বয়স এবং পর-পর লেখার হিসাবে এ তিনখানি গ্রন্থ,—বঙ্কিমের প্রথম স্তরের উপন্যাস। এইরূপ তাঁহার বয়স ও পর-পর লেখার হিসাবে,—তাঁহার রজনী, চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল প্রভৃতি,—তাঁহার দ্বিতীয় স্তরের উপন্যাস। ১২৭৯ হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৮৮

সাল পর্য্যন্ত,—৩৪ বর্ষ বয়স হইতে ৪৩ বর্ষ বয়সের মধ্যে,—বঙ্কিম ঐ সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; এবং এইরূপ হিসাবে ১২৮৮ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৯৩ সাল পর্য্যন্ত, তাঁহার প্রৌঢ় বয়সে লিখিত আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম,—এই তিনখানি তাঁহার তৃতীয় বা শেষস্তরের উপন্যাস বলিয়া পরিগণিত হয়। বাঁচিয়া থাকিলে, হয়ত তিনি আরও লিখিতেন।*

যাই হোক্, এই খুটী-নাটী সন-বৎসর ধরিয়া, যে উদ্দেশ্যে আমরা বঙ্কিমের পুস্তকপ্রকাশের এই হিসাবটি পরিষ্কার করিলাম, পাঠক এখন ইহার প্রতি একটু লক্ষ্য করুন।

যে হিসাবে বঙ্কিমের উপন্যাসের শ্রেণী-বিভাগ আমরা করিয়াছি, তাহাতে ও পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তকপ্রকাশের হিসাবে, বঙ্কিমের মানসিক ক্রমবিকাশ ও প্রতিভার গতি ঠিক খাপ খায় না। ইহার উপরও আবার বঙ্কিমের বিবিধ প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক গবেষণা, গভীর ধর্ম্মতত্ত্ব ও গীতার সমস্যা-ব্যাখ্যা আছে;—লোকরহস্য, বিজ্ঞানরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর আছে;—এবং "ইন্দিরা" "রাধারাণী" প্রভৃতি চুট্‌কি গল্প ও রঙ্গ-রস আছে।

* কথাপ্রসঙ্গে প্রবন্ধ-লেখককে একবার তিনি বলিয়াছিলেন, "এ বয়সে উপন্যাস আর লিখিব না;—এ বয়সের খাদ্য যা, তা এই দেখ।" এই বলিয়া তিনি হিন্দুর শ্রাদ্ধতত্ত্ব সম্বন্ধীয় একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ দেখাইলেন। কিন্তু কিছু দিন পরে,—জানি না কি ভাবিয়া,—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "এক খানি উপন্যাস লিখিব মনে করিতেছি। কিছু দিনের জন্য এ সহর ছাড়িয়া, দার্জ্জিলিং কি আর কোথাও গিয়া আব্-হাওয়াটা বদ্‌লাইব;—সেই অবসরে উপন্যাসখানি লিখিব মনে করিয়াছি।—কথাটা এখন অপ্রকাশ রাখিও।" দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার কিছুদিন পরেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

তবেই বুঝিয়া দেখুন, একটা লোকের প্রতিভার গতি কখন্ কোন্ পথে ছুটিয়াছে, ঠিক নির্ণয় করিবার যো নাই। পরন্তু ইহাতেই বঙ্কিমের অসাধারণত্ব ও বিশেষত্ব প্রমাণিত হয়।

আমার বোধ হয়, বঙ্কিমের প্রতিভা ও মনের এই ক্রম-বিকাশ,—পর্ব্বতের সহিত তুলনীয়। পর্ব্বত যেমন আঁকা-বাঁকা সূক্ষ্ম-স্থূল-বন্ধুর ও বিশৃঙ্খলতায় অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালী,বঙ্কিমের প্রতিভাও সেইরূপ শৃঙ্খলাহীন, পরন্তু অসীম শক্তিশালিনী ও লাবণ্যময়ী। পর্ব্বত সুন্দর কেন?—না, তাহা বৈচিত্র্যময়।—এই প্রস্তর, ঐ গহ্বর, এখানে গুল্ম, ওখানে প্রস্রবণ, এই আলো, ঐ ছায়া,—আবার ঐ গগনভেদী শিখর; -প্রকৃতির সে অপূর্ব্ব দৃশ্য অতি বিশৃঙ্খল হইয়াও সুন্দর,—অতুলনীয় সুন্দর!—বিশৃঙ্খল বলিয়াই সুন্দর, অথবা পর্ব্বতের এই বিশৃঙ্খলতাই পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য। বাহিরের এই সৌন্দর্য্য ব্যতীত আবার বুকে কত আশা, কত প্রেম! -পর্ব্বত কত জীব-জন্তুর আশ্রয়-স্থল, কত সাধু-সন্ন্যাসীর সাধন-মন্দির;—কত রত্নের আকর! —জীবনদায়িনী তরঙ্গিণী কুলু কুলু রবে পর্ব্বতের পাদতল বিধৌত করিয়া প্রবাহিতা!- পর্ব্বতের ভিতর-বাহির সুন্দর।

বঙ্কিমের প্রতিভা সম্বন্ধেও আমি এই কথা বলিতে পারি। তাঁহার প্রতিভার কোন শৃঙ্খলা ছিল না। অথবা এই বিশৃঙ্খলতাই তাঁহার প্রতিভাকে সর্ব্বতোমুখী করিয়াছে। বিশৃঙ্খল বলিয়াই তাঁহার প্রতিভা এত শক্তিশালিনী ও সৌন্দর্য্যময়ী; এবং শক্তিশালিনী ও সৌন্দর্য্যময়ী বলিয়াই এত মনোজ্ঞ ও অপূর্ব্ব। এই দেখি, বঙ্কিম গীতার ব্যাখ্যা লইয়া মস্তক আলোড়িত করিতেছেন, আবার পরক্ষণেই দেখি, একটি চুট্‌কি গল্প

বা মিঠা রসিকতার অবতারণা করিলেন। আবার হয়ত পরক্ষণেই দেখিতে পাইলাম, তিনি অতি গম্ভীরভাবে গুরুপদে আসীন হইয়া 'ধর্ম্মতত্ত্বের' অনুশীলনবাদ (Culture) বুঝাইতে বসিয়াছেন, অথবা কোন ঐতিহাসিকতত্ত্ব-উদ্ঘাটনে নিযুক্ত হইয়াছেন। গীতার বা ধর্ম্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা পড়িয়া যে মুহূর্ত্তে আকাশ-পাতাল ভাবিয়াছি, পর-মুহূর্ত্তেই তাঁহার প্রতিভার আর এক মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, প্রতিভার এই এলো-মেলো বিশৃঙ্খল-ভাব,— খুব বড় কবি ভিন্ন,—বঙ্কিমের ন্যায় কবি ভিন্ন আর কোথাও দেখিতে পাইবে না। এই বিষয় স্মরণ করিয়া সেই অদ্বিতীয় ফরাসী কবি,—কাব্য-জগতের "দ্বিতীয় সেক্সপিয়র"—ভিক্টর হুগোকে মনে পড়ে।

বঙ্কিমের এই উপন্যাসাবলী ও অন্যান্য গ্রন্থের আলোচনার পূর্ব্বে, বঙ্কিমকে আরও একটু ভাল করিয়া চিনিতে হইবে। কারণ, তাঁহাকে না চিনিলে তাঁহার গ্রন্থগুলি,—বিশেষ কাব্য-প্রাণ উপন্যাসাবলী চেনাও কঠিন হইবে। তাই আমরা এতক্ষণ নানাদিক্ দিয়া বঙ্কিমকে দেখিতেছিলাম,—তাঁহার সম্বন্ধে নানা অবান্তর কথার আলোচনা করিতেছিলাম। যদি এ আলোচনা সার্থক হইয়া থাকে, তবে বঙ্কিমের উপন্যাসাবলী ও অন্যান্য গ্রন্থ বুঝিতে, বোধ হয়, আমাদের অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না ;—বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যাও করিতে হইবে না। বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যার জন্যও এ গ্রন্থ লিখিত হয় নাই।—তাহা বঙ্কিম-ভক্ত সুলেখক স্বর্গীয় গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন।

৭

মৃণালিনীতে একটি গানের এক চরণে আছে,—

"চন্দ্রমাশালিনী যা মধু-যামিনী
না মিটল আশা রে।"

গানটি গাওয়াইয়াছেন বঙ্কিম তাঁহার একটি নায়িকার মুখ দিয়া; কিন্তু গানের অক্ষরে অক্ষরে যে মর্ম্মকাতরতা, যে আন্তরিকতা, যে আবেগ, যে উচ্ছ্বাস পরিব্যক্ত হইয়াছে,—তাহাতে লেখকের হৃদয় ও অন্তর কতকটা বুঝা যায়। বুঝা যায়, প্রেমিক বঙ্কিমও হৃদয়ে অপরিতৃপ্ত আশা লইয়া, এই সংসার-মরুতে দাঁড়াইয়া, উদাসপ্রাণে অন্তরের অন্তরে তপ্তশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে গায়িতেছেন,—

"চন্দ্রমাশালিনী যা মধুযামিনী
না মিটল আশা রে।"

স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার "সাধনা"য় "বঙ্কিমপ্রসঙ্গ" শীর্ষক যে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার একস্থল আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। বঙ্কিম বাবু কথাপ্রসঙ্গে নিজেই বলিতেছেন,—

"আমার জীবনে অনেক ভ্রম-প্রমাদ আছে, তা বলা বড় কঠিন, কাজেই জীবনী হইল না। সে সব বলিতে পারিলে অনেক কাজ হয়। একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড়

বেশী রকমের—আমার পরিবারের। আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহারও লিখিতে হয়। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম, বলিতে পারি না। আমার যত ভ্রম-প্রমাদ, তিনি জানেন আর আমি জানি। আমার জীবনের কতক বড় শিক্ষাপ্রদ, সকল বলিলে লোকে ভাবিবে, কি যে কি এক রকমের অদ্ভুত লোক ছিল। আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তাহা হইতে হিন্দুধর্ম্মে আমার মতি-গতি আশ্চর্য্য রকমের। কেমন করিয়া তাহা হইল, জানিলে লোকে আশ্চর্য্য হইবে। আমি আপন চেষ্টায় যা কিছু শিখেছি। কুসংসর্গটা ছেলেবেলায় বড় বেশী হ'য়েছিল। বাপ থাক্‌তেন বিদেশে, মা সেকেলের উপর আর একটু বেশী, কাজেই তাঁর কাছে কিছু শিক্ষা হয় নি। নীতিশিক্ষা কখন হয় নি। আমি যে লোকের ঘরে সিঁদ দিতে কেন শিখিনি বলা যায় না।"

এমন অকপট, নির্ব্বিকার ও উদার-প্রকৃতি না হইলে কি প্রকৃত কবি হওয়া যায়? কবি ভিন্ন এমন মন খুলিয়া মনের কথা বলিতে পারে,—আর কে? বঙ্কিম, জীবনে যেমন, কাব্যেও সেইরূপ সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। যেখানে যেমন কথাটি প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছেন,—দেশ, কাল, পাত্র কিছুতে দৃক্‌পাত না করিয়া তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বস্তুতঃ সত্যবাদিতা, নির্ভীকতা ও তেজস্বিতা-গুণে বঙ্কিমের লেখা এত মর্ম্মস্পর্শী। লেখা মর্ম্মস্পর্শী বলিয়াই, বঙ্কিম এত প্রবল-রূপে পাঠকের হৃদয়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন।

এখন যে কথা বলিতেছিলাম; হৃদয়ের গভীরতা হইতে যে নিরাশার ক্রন্দন উত্থিত হয়; যে তপ্তশ্বাস-স্পর্শে মানুষের

সহানুভূতি উদ্রিক্ত হয়; বঙ্কিমের জীবন,—বঙ্কিমের ন্যায় কবির জীবন—সেই ধাতুতে গঠিত। তাই কবির লেখা লোকে নিবিষ্টমনে পড়ে; কবির ভাবে বিভোর হয়; কবির মানস-চিত্র দর্শনে তন্ময় হইয়া যায়। অধিকন্তু কবির কাব্যে যে বিষয়টি উজ্জ্বলরূপে প্রস্ফুটিত হয়; যাহার ভাব ও ছবি পাঠকের বুক চিরিয়া বুকে বসে;—বুঝিতে হইবে,—সেইটি কবির বাঞ্ছিত বস্তু;—অথবা কবি নিজেই সেইটি,—বা সেই ভাবের প্রতিবিম্বটি। দর্পণে যেমন ছায়া পড়ে, কবির অন্তরস্থ ভাবের ছায়াও সেইরূপ,—কাব্যে প্রতিবিম্বিত হয়। সেই ছায়া দেখিয়া কবিকে চেনা, সকলের সাধ্যায়ত্ত না হইলেও, একেবারে অসম্ভব নয়। ব্যক্তিত্ব বা আত্মবিশেষত্ব, (personality) সকলের কাব্যে না থাকিলেও,—কাহারও কাহারও কাব্যে অতি অধিকমাত্রায় পরিস্ফুট হয়। ইংরেজীতে সেক্সপিয়র,—বিশেষতঃ বায়রণের কাব্যের অনেক স্থলে তাঁহার এই ব্যক্তিত্ব বা আত্ম-বিশেষত্ব, বহু পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য সেই সেই স্থল, বিশেষ ভাবিয়া পড়ার আবশ্যক।—ভাসা-ভাসা পড়িলে তাহা উপলব্ধি না হইবারই কথা। আমাদের বঙ্কিমের জীবন ও কাব্য—সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলেও, অনেক স্থলে তাঁহার এই ব্যক্তিত্ব বা জীবনের বিশেষত্ব বুঝা যায়। হইতে পারে, আমাদের এ ধারণা ঠিক নহে; পরন্তু যেমন বুঝিয়াছি, পাঠককেও ত সেই মত বুঝাইতে হইবে? সেই জন্যই বলিতে-ছিলাম, বঙ্কিমের ঐ কথাগুলি,—গানের ঐ একটিমাত্র চরণ আবৃত্তি করিলে মনে হয়, বঙ্কিমের প্রাণও যেন নিভৃতে, সর্ব্বচক্ষুর অন্তরালে, নিরাশ-মথিত হইয়া কাঁদিতেছে,—

"চন্দ্রমাশালিনী যা মধুযামিনী
না মিটল আশা রে।"

একটা দৃষ্টান্ত দেখাইলাম; চিন্তাশীল পাঠক বঙ্কিমের উপন্যাস-গ্রন্থ একটু ভাবিয়া পড়িলে, এইরূপ অনেক স্থান দেখিতে পাইবেন। দেখিতে পাইবেন, কবি আপন মনের কথা ও প্রাণের ব্যথা অনেক রকমে প্রকাশ করিতেছেন।—তাহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী ও কবিত্বময়।

বঙ্কিমের উপন্যাসের তিনটা ভাগ করিলেও সকল গ্রন্থেই তাঁহার নিজের একটা 'ধাত' দেখিতে পাই। সেই ধাতটিও তাঁহার ব্যক্তিত্ব প্রমাণ করে;—সেইটুকু তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব। আজ পর্য্যন্ত কোন লেখক তাহার অনুকরণে বা অতিক্রমণে সমর্থ হন নাই। সেই নিজস্ব,—অতি গভীর ও গম্ভীর বিষয়ের সহিত তাঁহার সেই "নির্ম্মল, শুভ্র, সংযত হাস্য।" বঙ্কিম আপন জীবনটাকেও কতকটা কাব্যময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। পরন্তু তাহাতে তাঁহার সাংসারিক জীবনের,—বৈষয়িক কাজ-কর্ম্মের কোন হানি হইত না। অতি গম্ভীর-প্রকৃতি হইলেও তিনি সুরসিক, আমোদ-প্রিয় ও সুহৃদ্বৎসল ছিলেন;—কার্য্যতৎপরতায় ও সামাজিকতায় তাঁহার বিলক্ষণ বিষয়-বুদ্ধি প্রকাশ পাইত। অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত অতি গুরুতর বিষয়ের আলাপ করিতে করিতে তিনি এমনই দুই একটি মর্ম্মস্পর্শী মধুর রসিকতার অবতারণ করিতেন যে, অতি সহজে ও শীঘ্র তাহা সকলের বোধগম্য হইত। * এমন সুরসিকতা ও

* বঙ্কিমবাবুর অগ্রজ সঞ্জীব বাবুর এই শক্তিটি আরও অধিক মাত্রায় ছিল;—ইহা তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের মুখে শুনিয়াছি।—তবে, যে কারণেই হউক, কাব্যে সঞ্জীবচন্দ্র তেমন ফুটিতে পারেন নাই।

সংযত সরস হাস্য খুব কম দেখিয়াছি।—বঙ্গসাহিত্যে এমন উচ্চাঙ্গের রসিকতা আর নাই বলিলেও হয়।

আদর্শ-চরিত্র-সৃজনে,—বিশেষ স্ত্রী-চরিত্র-চিত্রণে আধুনিক বঙ্গে বঙ্কিম অদ্বিতীয়। এ বিষয়ে অনেক বিশিষ্ট পাশ্চাত্য ঔপন্যাসিকও তাঁহার নিকট হার মানেন। বঙ্কিম হিন্দু কবি, বাল্মীকি-ব্যাসের দেশে তাঁহার জন্ম; পূর্ব্বজন্মে ও পর-কালে তাঁহার বিশ্বাস আছে;—তাই তিনি সীতা-সাবিত্রীর দেশের হিন্দু-রমণীকে সীতা-সাবিত্রীর মত করিয়া গড়িতে চান।—সংসারের খুটী-নাটী লইয়া চরিত্র-বিশ্লেষণে তাঁহাকে বড় বেগ পাইতে হয় না। প্রতি হাতে কৈফিয়ৎ দিয়াও তাঁহাকে সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে হয় না। পরন্তু পূর্ব্ব হইতে পাঠককে কতকটা প্রস্তুত হইয়া তাঁহার গ্রন্থ পড়িতে হয়। অন্ততঃ তাঁহার শেষস্তরের উপন্যাস—আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম সম্বন্ধে,—এই কথা। অপিচ, যেখানে এ পন্থার ব্যতিক্রম তিনি করিয়াছেন,—যেখানে পাঠককে কিঞ্চিৎ কৈফিয়ৎ দিতে গিয়াছেন,—সত্যের অনু-রোধে বলিতে হইবে,—সেইখানেই তাঁহার কবিত্ব কমিয়া গিয়াছে,—তাঁহার আদর্শ খাটো হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পাঠক 'চন্দ্রশেখর' গ্রন্থের সেই "শৈবলিনী" চিত্রটি স্মরণ করুন। শৈবলিনীর দেহ কলুষিত হইয়াছিল কিনা,—ফষ্টর কর্ত্তৃক তাহার নারী-ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছিল কিনা,—ইহা প্রতিপন্ন করিতে গ্রন্থকার বহু অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন;—স্বপ্ন, যোগবল, মীরকাশিমের এজলাস্, দেহতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব, প্রভৃতি নানা বিষয় লইয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে।—এইখানেই

বঙ্কিমের কবিত্ব কমিয়া গিয়াছে,—আদর্শ খাটো হইয়াছে,—তিনি এক সোপান নিম্নে নামিয়া পড়িয়াছেন। এইরূপ আবার "মৃণালিনীর"ও এক স্থান উল্লেখযোগ্য। মৃণালিনী যে সতী, হেমচন্দ্রকে ইহার প্রমাণ দিবার জন্য, সাক্ষীর জবানবন্দীর স্বরূপ, কবি সেই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রের একপ্রান্তে ব্যোমকেশকে লইয়া গিয়া,—পিপাসায় তাহার কণ্ঠতালু শুষ্ক করিয়া,—"একটু জল—বড় তৃষ্ণা"—ইত্যাকার কথা বলাইতে বলাইতে মৃণালিনীর সতীত্বগৌরব প্রকাশ করিলেন!—সত্যের অনুরোধে আবার বলি,—প্রতিভাবান্ কবির পক্ষে এটি উচ্চ ও সমীচীন কৌশল নহে। এরূপ কৈফিয়তেই প্রকৃত কবিত্ব লোপ পায়;—আদর্শ খাটো হইয়া থাকে। উপন্যাস-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্য-গ্রন্থে এই ক্রটিটি বিশেষ ক্রটি বলিয়া আমার মনে হয়।

যাই হোক্, আদর্শ-চরিত্র-সৃজনে বঙ্কিম যে, একজন বিশেষ শক্তিশালী পুরুষ, সে পক্ষে এতটুকুও সন্দেহ নাই। আদর্শ-চরিত্রের অপূর্ব্বত্ব কত,—তাহা আর একজন বঙ্কিম-ভক্ত লেখক স্থানান্তরে সপ্রমাণ করিয়াছেন। লেখক বলিতেছেন,—

"এই জন্যই দেখা যায়, হিন্দু কবি প্রায়ই আদর্শ-চরিত্র সৃষ্টি করেন। পূর্ব্বকার রামায়ণ মহাভারত হইতে আধুনিক উপন্যাস পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই হিন্দু-কবির চেষ্টা,—আদর্শ-চরিত্র সৃষ্টি। অদৃষ্ট ও পুরুষকারের সহিত যুদ্ধে পুরুষকারের জয় ঘোষণা করাই হিন্দু-কবির প্রধান উদ্দেশ্যে। * * * কিন্তু ইউরোপীয় কবিগণ কাব্যে বা উপন্যাসে প্রায়ই এরূপ আদর্শ-চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা করেন নাই। * * * পূর্ব্বকার কথা যাউক, আমাদের দেশের চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, সত্যানন্দ, সূর্য্যমুখী,

লবঙ্গলতা, প্রফুল্ল ও শ্রীর মত আদর্শ-চরিত্র-চিত্রও বিলাতী নবেলে পাওয়া যায় না।” *

লেখক এ কথা প্রমাণ করিবার জন্য মনস্বী রাস্কিনের “Queen's Garden” শীর্ষক প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, অন্যে পরে কা কথা,—“বিলাতী কবি সেক্সপিয়র বা স্কট্ কেহই বড় আদর্শ নর-চরিত্র সৃষ্টি করেন নাই, কয়টী বিলাতী আদর্শ-নারী-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র।” লেখক আর এক স্থানে বলিয়াছেন,—“এই বিশেষত্বের প্রথম কারণ, (প্রথম কেন, প্রধান এবং একমাত্র কারণ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না) হিন্দুর ধর্ম্মভাব। * * * বাঙ্গালার প্রধান কবি, তাঁহার অতুল্য প্রতিভাবলে তাঁহার উপন্যাসে এই বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছেন। * * * * শুধু বাঙ্গালায় কেন, যখন জগতের সাহিত্য মধ্যে এই উপন্যাসগুলি প্রচার হইবে, (আশা করা যায়, সেদিন আসিতে অধিক বিলম্ব নাই) তখন উল্লিখিত বিশেষত্ব জন্যই এই সকল উপন্যাস সমস্ত জগৎ মধ্যে বিশেষ আদৃত হইবে এবং সেগুলি জগতের উপন্যাস মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে।”

দেবেন্দ্রবিজয় বাবুর যে কথা, আমাদেরও সেই কথা। বস্তুতঃ বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি আমরা এমনই ভালবাসার চক্ষে দেখিয়া থাকি। কারণ, বঙ্কিমের লক্ষ্য বড় উচ্চ, বড় মহৎ।—সমগ্র জগৎ যাহার আদর্শ লইয়া চলিতে পারে, প্রতিভাবান্ বঙ্কিম কোন কোন গ্রন্থে সেইরূপ সার্ব্বজনীন আদর্শচরিত্র সৃষ্টি করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন।

* শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু-লিখিত “বাঙ্গালা উপন্যাসের বিশেষত্ব।”-নব্যভারত, দ্বাদশ খণ্ড; ৪র্থ সংখ্যা।

বিশেষতঃ, বঙ্কিমের উপন্যাসের স্ত্রীচরিত্র যে এত উচ্চ আদর্শে অঙ্কিত, তাহার প্রধান কারণ,—নারীজাতিকে বঙ্কিম বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। তিনি নিজেও বলিতেন,—"এ দেশের স্ত্রীরাই মানুষ।" শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বলেন,—"বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের আধখানা তাঁহার স্ত্রী।"—অর্থাৎ গুণবতী সতী সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর গুণাবলীর আদর্শে তাঁহার অধিকাংশ স্ত্রীচরিত্র প্রস্ফুটিত। স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের "বঙ্কিম-প্রসঙ্গের' সেই ছত্রটিও এখানে পুনরুল্লেখ করিতে পারি,—"একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের—আমার পরিবারের।" এ সকল কথাও ছাড়িয়া দিয়া—আর এক জনের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে আমাদের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন,—"বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের আধখানা তাঁহার স্ত্রী কি ? উৎকৃষ্ট অংশের সবটাই।" ইনি বঙ্কিম বাবুর একজন বিশিষ্ট আত্মীয়, এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুও বটেন। বঙ্কিম বাবুর জীবনের অনেক ঘটনা ইনি অবগত আছেন। বঙ্কিম বাবুর সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর,—সেই গুণবতী হিন্দু-পত্নীর অনেক পবিত্রকাহিনী ইনি আমাদিগকে বলিয়াছেন। নানা কারণে সে সকল কথা প্রকাশ করা এক্ষণে যুক্তিযুক্ত বোধ করিলাম না। যাই হোক, স্ত্রীজাতিকে বঙ্কিম যে, অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন, সে সমন্ধে আর কথাটি নাই। নারীজাতীয় প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা না থাকিলে, উপন্যাসে তিনি এমন অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিতে পারিতেন না। ইউরোপের এমন এক এক দিন গিয়াছে, যখন Knightগণ Chivalric Spirit-এ নারীজাতির প্রতি বিশিষ্ট সম্মান

দেখাইতেন।—নারীজাতির প্রতি আমাদের বঙ্কিমের সম্মানও বোধ হয়, তাহার কাছাকাছি!

স্ত্রীচরিত্র অঙ্কনে বঙ্কিমের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোককেই তিনি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারিতেন। যখন দেবী আঁকিয়াছেন, তখনও যেমন গুণপনার পরিচয় দিয়াছেন, যখন দানবী আঁকিয়াছেন, তখনও সেইরূপ সূক্ষ্ম-দর্শিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাঁহার সূর্য্যমুখী, ভ্রমর, মনোরমা, লবঙ্গলতা, প্রফুল্ল, শ্রী, জয়ন্তী, শান্তি, কল্যাণী, কপাল-কুণ্ডলা প্রভৃতি স্ত্রী-চরিত্র অতি অপূর্ব্ব সৃষ্টি।—এমন সৃষ্টি কেবল প্রকৃতির বিশাল বুকে ও কবির মানসপটেই শোভা পায়। আবার যখন তিনি দানবী হীরা, পাপ রোহিণী ও জেব-উন্নিসা এবং আর এক অংশে সেই দুঃসাহসিনী শৈবলিনীকে আঁকিয়াছেন,তখনও সেইরূপ অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত দেখাইতে এমন 'ওস্তাদী' হাত আর কোথাও দেখি না। "মানব-জীবনের কঠোর সমস্যা" বিশ্লেষণকেই বঙ্কিম বাবু উপন্যাস বলিতেন। সূক্ষ্মদর্শী ও সুলেখক ৺গিরিজা-প্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়,—তাঁহার "বঙ্কিমচন্দ্র" গ্রন্থে, বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসাবলীর বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যায় বিশেষ নিপুণতার সহিত এই কথা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি যে প্রেম, সেই অহেতুক অপার্থিব বস্তু লইয়া, বঙ্কিম সেই "মানব জীবনের মহা-সমস্যা" "ছকে" ফেলিতেন। এই ছকে তাঁহার প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, গোবিন্দলাল, নগেন্দ্রনাথ, অমরনাথ, পশুপতি, হেমচন্দ্র, ভবানন্দ প্রভৃতি অঙ্কিত। প্রেমে কেহ নিজে পুড়িয়াছেন, কেহ আর একজনকে পোড়াইয়াছেন।

উপন্যাসের মূল আখ্যায়িকা বা কাহিনী (Plot) উদ্ভাবনে বঙ্কিমের তেমন কৃতিত্ব ছিল না বটে, কিন্তু অতি সামান্য দুই একটি মাত্র ঘটনা লইয়া, সামান্য দুই একটি রেখাপাতে, তিনি যেরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যে অতুল্য। তাঁহার "কৃষ্ণকান্তের উইল"—এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অবশ্য, বঙ্কিমের সকল গল্প ও ঘটনাসমাবেশ মৌলিক (Original) নহে; ইংরেজী কাব্যের ভাব ও ছায়া তাঁহার প্রধান উপকরণ; পরন্তু তাহাতে কিছু যায়-আসে না। মৌলিকতা বা প্রতিভাও ত কতকটা দেখিয়া শুনিয়া লাভ করিতে হয়? মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই ত আর কেহ মহাকবি হইতে পারে না? সংগ্রহ, অনুসন্ধান ও তদুপরি প্রখর অন্তর্দৃষ্টি এবং ধারণাশক্তি যাহার যত অধিক,—বিদ্যুদ্বৎ সর্ব্বভেদী বুদ্ধির বিকাশ যাহার যে পরিমাণে হইয়া থাকে, সেই-ই সেই পরিমাণে প্রতিভা-ধনে অধিকারী হয়। বলিবে, তাহাতে মৌলিকতা থাকিবে কিরূপে? এ কথাটার উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমি কবির ভাষায় তোমায় একটি প্রশ্ন করি,—"জগৎ-সৃষ্টির পরে, সূর্য্যের নিম্নে, এই পৃথিবীতে আর কি নূতন বস্তু বা আশ্চর্য্য বিষয় আছে?"—ভগবানের সৃষ্টির পরে তুমি আমি আর কি নূতন বা আশ্চর্য্যময় সৃষ্টি দেখাইতে পারি? সুতরাং সে হিসাবে, সকলই পুরাতন,—সকলই অতীতের স্মৃতিমাত্র। তবে প্রতিভাবান্ কবি আপন অতুল্য প্রতিভাবলে সেই পুরাতনকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া,—অজ্ঞাত অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তুকে লোকলোচনের সমীপবর্ত্তী করিয়া, বিধি-সৃষ্টিরই মহিমা প্রকাশ করেন।—সে হিসাবে কবি একজন নূতন আবিষ্কারক ও সৃষ্টিকর্ত্তা বটেন, এবং সে

হিসাবে এই পরিদৃশ্যমান্ পৃথিবীতে অসংখ্য অপরিমেয় আশ্চর্য্য-ময় নূতন বস্তুও রহিয়াছে,—যুগ যুগ ধরিয়া অসংখ্য অগণিত কবিও যাহা লিখিয়া শেষ করিতে পারিবেন না!—এমন কি, দর্শন-বিজ্ঞান তাহার ধারণা এবং কল্পনা করিতেও অক্ষম। ফল কথা, নূতনত্ব বা মৌলিকত্ব আকাশ হইতে আপনা-আপনি পড়ে না.—কবিকে তাহা গভীর অনুসন্ধানে, দুঃসাধ্য সংগ্রহে, অশ্রান্ত পরিশ্রমে, বা সাধনায় ও ধ্যান ধারণায় আয়ত্ত করিতে হয়।

বলা বাহুল্য, এ কয়টি গুণই বঙ্কিমের প্রচুর পরিমাণে ছিল। এক "কৃষ্ণচরিত্রের" পরিশ্রম এবং সংগ্রহই—(খানিকটা বৃথা হইলেও) এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তার পর, বঙ্কিম ত দূরের কথা,—মহাকবি সেক্সপিয়রও অন্য গ্রন্থ হইতে গল্পের সারভাগ সঙ্কলন করিয়া নাটকাদি লিখিয়া গিয়াছেন; কখন বা প্রচলিত "কাহিনী"র উপরও ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। আর আমাদের 'ভারতের কালিদাস' যে অপূর্ব্ব "অভিজ্ঞান শকুন্তল" গ্রন্থ লিখিয়া জগতের পূজ্য হইয়া আছেন,তাহার মূলও ত সেই "মহাভারত" অথবা মতান্তরে "পদ্মপুরাণ?" আর কিছুদিন হইল, "সাহিত্য" পত্রে যে, বাঙ্গালার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পাঠ্য—মহাকবি ভারতচন্দ্রের সেই বিশ্ববিশ্রুত "বিদ্যাসুন্দরের" গল্পের মৌলিক-তত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে,—যদি তাহা ঠিক হয়, তাহা হইলে ত, বিদ্যাসুন্দরের গল্পের উদ্ভাবনাও—ভারতচন্দ্রের নিজের নহে? * পরন্তু তাই বলিয়াই কি সেই জগদ্বিখ্যাত কবিকুলের গৌরবহানি ও

* মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিত প্রবন্ধ।—সাহিত্য, চতুর্থ বৎসর, ১৩০০।

কবিত্ব "ন-কড়া ছ-কড়া" হইয়া গেল? না, তাহা হয় নাই,—হইবেও না,—হইবার নহে। সেক্সপিয়র বা কালিদাস এবং ভারতচন্দ্র বা বঙ্কিমচন্দ্র যেমন সর্ব্বত্র পূজিত হইতেছেন, চিরদিনই সেইরূপ পূজা পাইবেন। আসল কথা হইতেছে প্রতিভা,—আর সেই প্রতিভা সৃষ্টিকরী কি না?

সাহস করিয়া বলিতে পারি, হাঁ, আমাদের বঙ্কিমের প্রতিভা সৃষ্টিকরী,—অদ্ভুত শক্তিশালিনী সৃষ্টিকরী।

৮

এখন আমরা দেখাইতে চাই, এক উপন্যাসের মধ্যেই প্রতিভাবান্ বঙ্কিম,—একাধারে কবি, দার্শনিক, নীতিবেত্তা, ঐতিহাসিক, নাটককার ও সমালোচক। আমাদের স্থানাভাব; সুতরাং অতি সংক্ষেপে বঙ্কিমের গ্রন্থ হইতে আমরা দুই এক স্থান উদ্ধৃত করিয়া এই বিষয়টির আলোচনা করিব।

কবি বঙ্কিমের কবিত্ব,—বঙ্কিমের সেই প্রথম যুবাবয়সের সেই 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে আরম্ভ করিয়া,—প্রৌঢ়ের বা বৃদ্ধাবস্থার সেই 'সীতারাম' 'রাজসিংহে' * পর্য্যন্ত সমান ভাবে পরিলক্ষিত হয়। বরং বয়োধর্ম্মের গাঢ়তায়, যুবাকালের সেই স্বাভাবিক কিন্তু তরল কবিতা,—ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর—গাঢ়তম হইয়া অতি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। পাঠক 'দুর্গেশনন্দিনী'র সেই পরিত্যক্তা 'নিরাশ-প্রণয়িনী' আয়েসার সেই শেষদৃশ্যটি স্মরণ করুন;—

রাত্রিকাল; আয়েসা দুর্গপ্রাকার-মূলে উদাস প্রাণে দাঁড়াইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছেন, অঙ্গুলি হইতে একবার গরলাধার অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিলেন, ভাবিলেন, "এই রস পান করিয়া এখনই সকল তৃষা নিবারণ করিতে পারি"। আবার পরক্ষণেই

* নূতন সংস্করণ।

ভাবিলেন, —"এই কার্য্যের জন্যই কি বিধাতা আমাকে সংসারে পাইয়াছিলেন! যদি এ যন্ত্রণা সহিতে না পারিব, তবে নারীজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম কেন?" * * * "আবার অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিতে পরিলেন, আবার কি ভাবিয়া খুলিয়া লইলেন। ভাবিলেন,—'এ লোভ সংবরণ করা রমণীর অসাধ্য; প্রলোভনকে দূর করা ভাল।' "এই বলিয়া আয়েসা গরলাধার অঙ্গুরীয় দুর্গ-পরিখার জলে নিক্ষিপ্ত করিলেন।"

চিত্রটি কেমন বলুন দেখি? সেই সুষুপ্তা রজনী; সমস্ত পৃথিবী নিস্তব্ধ; আকাশে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র জ্বলিতেছে; "জল-পরিপূর্ণ দুর্গপরিখা নীরবে আকাশপট-প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া আছে"—সেই সময়ে সেই নিরাশ-প্রণয়িনী নবাব-পুত্রী দুর্গ-প্রাকার-মূলে দাঁড়াইয়া, হৃদয়ের তপ্তশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ঐরূপ ভাবিতেছেন। মানবের অন্তঃপ্রকৃতির সহিত বাহ্য-প্রকৃতির যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ও সহানুভূতি, কবি তাহা এইরূপেই দেখাইলেন।

বঙ্কিমের প্রথম বয়সের কবিত্বের নমুনা এই; এখন তাঁর শেষ-বয়সের কবিত্বের একটু পরিচয় দিই। সীতারাম হইতে যদৃচ্ছাক্রমে এইটুকু উদ্ধৃত করিলাম;—

"তখন দুই শ্রীতে শ্রী ভাসিয়া গেল। তার পর আর শ্রীর কোন খবর নাই।

"স্বীকার করি, তবু শ্রীকে মনে করা সীতারামের উচিত ছিল। কিন্তু এমন অনেক উচিত কাজ আছে যে, কাহারও মনে হয় না। মনে হইবার একটা কারণ না ঘটিলে মনে হয় না। যাহার নিত্য টাকা আসে, সে কবে সিকিটা আধুলিটা হারাই-

য়াছে, তার তা বড় মনে পড়ে না। যার একদিকে নন্দা, এক দিকে রমা, তার কোথাকার শ্রীকে কেন মনে পড়িবে? যার এক দিকে গঙ্গা, এক দিকে যমুনা, তার কবে কোথায় বালির মধ্যে সরস্বতী শুকাইয়া লুকাইয়া আছে, তা কি মনে পড়ে? যার এক দিকে চিত্রা আর দিকে চন্দ্র, তার কবে কোথাকার নিবান-বাতির আলো কি মনে পড়ে? রমা সুখ, নন্দা সম্পদ, শ্রী বিপদ—যার এক দিকে সুখ, আর দিকে সম্পদ, তার কি বিপদকে মনে পড়ে?"

অন্যত্র ;—

"হায় নূতন! তুমিই কি সুন্দর? না, সেই পুরাতনই সুন্দর? তবে, তুমি নূতন! তুমি অনন্তের অংশ। অনন্তের একটুখানি মাত্র আমরা জানি। সেই একটুখানি আমাদের কাছে পুরাতন। অনন্তের আর সব আমাদের কাছে নূতন। অনন্তের যাহা অজ্ঞাত, তাহাও অনন্ত। নূতন তুমি অনন্তেরই অংশ। তাই তুমি এত উন্মাদকর। শ্রী, আজ সীতারামের কাছে অনন্তের অংশ।"

প্রথমের দিলাম, শেষের দিলাম,—এখন বঙ্কিমের মধ্য বয়সেরও একটু কবিত্বের পরিচয় দিই।

পাঠক! 'চন্দ্রশেখরে' প্রতাপ-শৈবলিনীর সেই "অগাধ জলে সাঁতার" দৃশ্যটি স্মরণ করুন ;—

"দুইজনে সাঁতারিয়া, অনেক দূর গেল। কি মনোহর দৃশ্য! কি সুখের সাঁতার! এই অনন্ত দেশব্যাপিনী, বিশাল হৃদয়া, ক্ষুদ্র বীচিমালিনী, নীলিমাময়ী তটিনীর বক্ষে, চন্দ্রকর সাগরমধ্যে ভাসিতে ভাসিতে, সেই ঊর্দ্ধস্থ অনন্ত নীলসাগরে

দৃষ্টি পড়িল। তখন প্রতাপ মনে করিল, কেনই বা মনুষ্য-অদৃষ্টে ঐ সমুদ্রে সাঁতার নাই? কেনই বা মানুষে ঐ মেঘের তরঙ্গ ভাঙ্গিতে পারে না? কি পুণ্য করিলে ঐ সমুদ্রে সন্তরণকারী জীব হইতে পারি? সাঁতার? কি ছার ক্ষুদ্র পার্থিব নদীতে সাঁতার? জন্মিয়া অবধি এই কাল-সমুদ্রে সাঁতার দিতেছি। তরঙ্গ ঠেলিয়া তরঙ্গের উপর ফেলিতেছি,—তৃণবৎ তরঙ্গে তরঙ্গে বেড়াইতেছি—আবার সাঁতার কি?

"প্রতাপ ডাকিল, "শৈবলিনী—শৈ।"

"শৈবলিনী চমকিয়া উঠিল—হৃদয় কম্পিত হইল। বাল্য-কালে প্রতাপ তাহাকে "শৈ" বা "সই" বলিয়া ডাকিত। আবার সেই প্রিয় সম্বোধন করিল, কতকাল পরে! বৎসরে কি কালের মাপ! ভাবে ও অভাবে কালের মাপ। শৈবলিনী যত বৎসর সেই শব্দ শুনে নাই, শৈবলিনীর সেই এক মন্বন্তর। এখন শুনিয়া শৈবলিনী সেই অনন্ত জলরাশি মধ্যে চক্ষু মুদিল। মনে মনে চন্দ্রতারাকে সাক্ষী করিল। চক্ষু মুদিয়া বলিল, "প্রতাপ! আজিও এ মরাগঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?" * * *

তার পর শুন। প্রতাপ বলিতেছে, "শপথ কর,—আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ কর—আমার মরণ বাঁচন শুভাশুভের তুমি দায়ী—

"শৈ। তোমার শপথ—তুমি যা বলিবে, ইহজন্মে তাহাই আমার স্থির।"

* * * *

"শৈবলিনী শপথ করিতে পারিল না। বলিল—"এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে, প্রতাপ?

"প্র। আমি!

"শৈ। তোমার ঐশ্বর্য্য আছে,—বল আছে—কীর্ত্তি আছে—বন্ধু আছে—ভরসা আছে—রূপসী আছে,—আমার কি আছে, প্রতাপ?

"প্র। কিছু না—আইস, তবে দুইজনে ডুবি।" * * *

জীবনের উষা, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা,—তিন সময়ের তিনটি কবিত্বের নমুনা দেখাইলাম। পাঠক দেখুন, স্বভাব-কবি বঙ্কিমের কি অদ্ভুত কবিপ্রতিভা! এমনই দুর্লভ কবিত্ব ধনের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই না আজ তিনি বাঙ্গালীর হৃদয় যুড়িয়া আসন লইয়াছেন? ফলতঃ এমন উৎকৃষ্ট গদ্য-কাব্য আর কোন বাঙ্গালী কবি আজ পর্য্যন্ত লিখিতে সক্ষম হন নাই।

সমজদার পাঠক অবগত আছেন, পদ্যে যেমন, গদ্যেও তেমনই একটা সুর তান লয় আছে;—অন্ততঃ প্রথম শ্রেণীর গদ্য-লেখকগণের তাহাই থাকে। বঙ্কিমের গদ্য লেখায় এই সুর তান লয় প্রচুর পরিমাণে আছে। উদ্ধৃত অংশই তাহার প্রমাণ। পরন্তু পদ্যময় গানেও বঙ্কিম কিরূপ শক্তিশালী, তাহা সেই স্বদেশ-ভক্তিময় দেশপ্রসিদ্ধ "বন্দে মাতরং" গানটিতে দেখিবেন।

বন্দে মাতরং-এর ন্যায় কবিত্বময়—শান্ত-ভক্তি-রসাশ্রিত অথচ জাতীয়ভাব-উদ্দীপনপূর্ণ গান,—অতি অল্পই শুনিতে পাওয়া যায়। হেমচন্দ্রের "ভারত-সঙ্গীত" এবং গোবিন্দচন্দ্রের "নির্ম্মল সলিলে"—উৎকৃষ্ট হইলেও, অন্য সুরে বাঁধা।

এইবার দার্শনিক বঙ্কিমের একটু পরিচয় লউন;—

'বন্ধু-কন্যা' ভ্রমরের জীবন রক্ষার্থ নিশাকর ভাবিতেছেন,—"আমি কি নৃশংস! একজন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি! অথবা নৃশংসতাই বা কি? দুষ্টের দমন অবশ্যই কর্ত্তব্য। * * কিন্তু আমার মন ইহাতে প্রসন্ন নয়। রোহিণী পাপীয়সী, পাপের দণ্ড দিব; পাপ-স্রোতের রোধ করিব; ইহাতে অপ্রসাদই বা কেন? বলিতে পারি না,—বোধ হয়, সোজা পথে গেলে এত ভাবিতাম না। * * আর পাপ-পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার দিবার আমি কে? আমার পাপ-পুণ্যের যিনি দণ্ড পুরস্কার করিবেন, রোহিণীরও তিনি বিচারকর্ত্তা। বলিতে পারি না, হয়ত তিনিই আমাকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। কি জানি,

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"*

বোধ করি, পৃথিবীর আবহমান কাল হইতে এই তত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটনে দার্শনিকগণ মস্তক আলোড়িত করিতেছেন।

নীতিবেত্তা বঙ্কিমের একটু পরিচয় গ্রহণ করুন;—

রমানন্দস্বামী চন্দ্রশেখরকে উপদেশ দিতেছেন;—

"শুন, বৎস চন্দ্রশেখর! যে সকল বিদ্যা উপার্জ্জন করিলে, সাবধানে প্রয়োগ করিও। আর কদাপি সন্তাপকে হৃদয়ে স্থান দিও না। কেন না, দুঃখ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। সুখ দুঃখ—তুল্য বা বিজ্ঞের কাছে একই। যদি প্রভেদ কর, তবে যাহারা পুণ্যাত্মা বা সুখী বলিয়া খ্যাত, তাহাদের চিরদুঃখী বলিতে হয়।"

---

* কৃষ্ণকান্তের উইল।

যে ধর্ম্মাত্মা চন্দ্রশেখর 'আত্মশোণিততুল্য' গ্রন্থাদি দাহ করিয়া গুরুপদে শরণ লইয়াছেন, সেই গুরু তাঁহাকে এই উপদেশ দিতেছেন। ধর্ম্মবেত্তা 'পুলপিটে' দাঁড়াইয়াও হৃদয়ে যে ভাব দিতে পারেন না, কবি বঙ্কিম একটুখানি রং ফলাইয়া তাহা কাব্যচিত্রে অতি উজ্জলরূপে পাঠকের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছেন।

অন্যত্র,—

প্রণয়ের গতি বুঝাইয়া কবি বলিতেছেন,—

"পাপাসক্তকেও ভালবাসিতে হইবে। প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই। সকলকেই ভালবাসিবে। প্রণয় জন্মিলেই তাহাকে যত্নে স্থান দিবে, কেননা প্রণয় অমূল্য। ভাই, যে ভাল, তাকে কে না ভালবাসে? কিন্তু যে মন্দ, তাকে যে আপনা ভুলিয়া ভালবাসে, আমি তাকে বড় ভালবাসি।" *

বিশুদ্ধ প্রেমের ধর্ম্মই এই। সংসারে এ প্রেম একান্ত দুর্লভ। এ প্রেমের কণামাত্রও সংসারে থাকিলে অনেক আগুন নিবিয়া যাইত!

ঐতিহাসিক বঙ্কিম তাঁহার নূতনসংস্করণ "রাজসিংহে" ভারতের ইতিহাসের একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই 'রাজসিংহ' বঙ্গসাহিত্যের একখানি প্রধান ঐতিহাসিক উপন্যাস। রাজসিংহের "নির্ম্মলা" চিত্রটি বড়ই সুন্দর। আর "দরিয়া" চরিত্রটি, অতি সংক্ষিপ্ত হইলেও, বড়ই মনোজ্ঞ। একটু

---

* হেমচন্দ্রের প্রতি মনোরমার উক্তি।—মৃণালিনী।

ভাবিয়া পড়িলে, বোধ হয়, এই চিত্রটি কবির বড়ই প্রিয় , কিন্তু যে কারণে হউক, এটি কাব্যে তেমন ফুটে নাই।

নাটককার বঙ্কিম 'সীতারাম'-চিত্রে, 'পশুপতি'-চরিত্রে', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'শান্তি'র ছবিতে, অতি সুন্দররূপে নাটকের ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছেন।

সমালোচক বঙ্কিম "কপালকুণ্ডলা"য় অদৃষ্টবাদের এবং "সীতারামে" সৌন্দর্য্যতত্ত্বের কেমন সুন্দর সমালোচনা করিয়াছেন, পাঠক তাহা ঐ দুই গ্রন্থ নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিয়া দেখিবেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, আমাদের স্থানাভাব, এবং সকল বিষয় বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যার জন্যও এ গ্রন্থ লিখিত হয় নাই,—তাই স্থানবিশেষে পাঠককে বঙ্কিমের মূলগ্রন্থ বরাৎ দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইব।

কবিত্বে, দর্শনে, নীতি-উপদেশে, ইতিহাসে, নাটকে ও সমালোচনায় বঙ্কিম কিরূপ শক্তিশালী, পাঠক প্রসঙ্গক্রমে সে পরিচয় আরও পাইবেন।

বঙ্কিম আত্মজীবনে বুঝিয়াছিলেন এবং কাব্যেও বিধিমতে বুঝাইয়া গিয়াছেন,—সুখ আত্মপ্রতিষ্ঠায় নহে,—আত্ম-বিসর্জ্জনে। 'জয়ন্তী', 'শান্তি', 'প্রফুল্ল' ও 'সত্যানন্দের" মুখে পাঠক ইহার সম্যক্ পরিচয় গ্রহণ করিবেন। আমরা যদৃচ্ছাক্রমে "আনন্দমঠ" হইতে একস্থান উদ্ধৃত করিয়া ইহার একটুমাত্র পরিচয় দিলাম ;—

"সায়াহ্নকৃত্য সমাপনান্তে মহেন্দ্রকে ডাকিয়া সত্যানন্দ আদেশ করিলেন,—

"তোমার কন্যা জীবিত আছে।"

"মহেন্দ্র। কোথায় মহারাজ ? * * *

সত্য। * * * কোথায়, শুনিতে চাহিও না।

মহেন্দ্র। কেন মহারাজ !

সত্য। যে এ ব্রত গ্রহণ করে, তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বজনবর্গ কাহারও সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে নাই। স্ত্রী, পুত্র, কন্যার মুখ দেখিলেও প্রায়শ্চিত্ত আছে। যতদিন না সন্তানের মানস সিদ্ধ হয়, ততদিন, তুমি কন্যার মুখ দেখিতে পাইবে না। অতএব যদি সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ স্থির হইয়া থাকে, তবে কন্যার সন্ধান জানিয়া কি করিবে ?—দেখিতে ত পাইবে না।

মহেন্দ্র। এ কঠিন নিয়ম কেন প্রভু ?

সত্য। সন্তানের কাজ অতি কঠিন কাজ। যে সর্ব্বত্যাগী, সে ভিন্ন অপর কেহ এ কাজের উপযুক্ত নহে। মায়া-রজ্জুতে যাহার চিত্ত বদ্ধ থাকে, লকে বাঁধা ঘুঁড়ির মত সে কখন মাটি ছাড়িয়া স্বর্গে উঠিতে পারে না।

মহেন্দ্র। মহারাজ, কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। যে স্ত্রী-পুত্রের মুখ দর্শন করে, সে কি কোন গুরুতর কার্য্যের অধিকারী নহে ?

সত্য। পুত্র-কলত্রের মুখ দেখিলেই আমরা দেবতার কাজ ভুলিয়া যাই। সন্তানধর্ম্মের নিয়ম এই যে, যে দিন প্রয়োজন হইবে, সেই দিন সন্তানকে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। তোমার কন্যার মুখ মনে পড়িলে তুমি কি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিবে ?

মহেন্দ্র। তাহা না দেখিলেই কি কন্যাকে ভুলিব ?

সত্য। না ভুলিতে পার, এ ব্রত গ্রহণ করিও না।" * * *

অন্যত্র ;—

যুদ্ধে জয়লাভ হইলে যখন জীবানন্দ সত্যানন্দকে সিংহাসনে স্থাপিত করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন সত্যানন্দ বলিলেন,—

"ছি! আমায় কি শূন্য কুম্ভ মনে কর? আমরা রাজা কেহ নহি। আমরা সন্ন্যাসী। এখন দেশের রাজা বৈকুণ্ঠনাথ স্বয়ং। নগর অধিকার হইলে, যাঁহার শিরে তোমাদিগের ইচ্ছা হয়, রাজমুকুট পরাইও; কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিও যে, আমি এই ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন আর কোন আশ্রমই স্বীকার করিব না। এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব কর্ম্মে যাও।"

এমনই আত্মত্যাগী না হইলে কি সকলের বড় হইয়া এক সোপান উচ্চে অবস্থিতি করা যায়?

অতি বড় উচ্চ আদর্শ—"পরের মঙ্গলমন্দিরে প্রাণের প্রাণ বলি" দিতে মহাকবি বঙ্কিম জগৎকে ইঙ্গিত করিতেছেন। তদ্বিরচিত প্রায় সকল উপন্যাস হইতেই একথা প্রমাণ করা যায়। কিন্তু উপস্থিত ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্যক্ প্রকারে তাহা প্রমাণ করা একরূপ অসম্ভব এবং বোধ করি, বিশেষ আবশ্যকও নাই। পাঠককে বঙ্কিমের উপন্যাসাবলী একটু নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিয়া স্বয়ং এ বিষয় অনুভব করিতে হইবে।

বঙ্কিমের উপন্যাসের আর একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, প্রায় সকল গুলিতেই এক একটি মহাপুরুষের চরিত্র—গুরুর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস—'দুর্গেশ-নন্দিনী' হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বশেষ উপন্যাস—'সীতারাম' পর্য্যন্ত এই গুরুর আলোকে উজ্জ্বলীকৃত। গুরু, ইহ-পরকালের একমাত্র সহায়, সংসার-গহনে পথ-প্রদর্শক। হিন্দুর গুরুবাদে

বঙ্কিমের আন্তরিক আস্থা ছিল। জাতীয় সাহিত্যে—বিশেষ কাব্য-উপন্যাসে এ জিনিসটি বড়ই চমৎকার।

অদৃষ্টবাদেও বঙ্কিমের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। 'কপালকুণ্ডলার' ভবানী-পাদপদ্মে বিল্বপত্রদান তাহার অন্যতম নিদর্শন। শুধু ইহাই নহে,—বঙ্কিমের প্রায় সকল উপন্যাসেরই অস্থি-মজ্জা এবং মেরুদণ্ড,—অদৃষ্ট। ইহার আর একটি প্রমাণ, জ্যোতিষ-শাস্ত্রকে বঙ্কিম যথেষ্ট মান্য ও শ্রদ্ধা করিতেন। জ্যোতিষ, নিজে কিছু কিছু শিখিয়াও ছিলেন। আন্তরিক আস্থা ও অনুরাগ না থাকিলে, তিনি এ বিদ্যার অনুশীলন করিবেন কেন এবং আত্মপ্রতিবিম্বতুল্য কাব্যেই বা তাহার প্রাধান্য দিবেন কেন? —যে যা বলে বলুক, ইহা হইতেই পাঠক সহজে সিদ্ধান্ত করিতে পারেন,—বঙ্কিম একজন অদৃষ্টবাদী হিন্দু।

এখন আমরা এই "কপালকুণ্ডলাকে" উপলক্ষ করিয়া, কাব্য সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, তাহা ব্যক্ত করিব।

৯

কাব্যাংশে "কপালকুণ্ডলা" বঙ্কিমের অপূর্ব্ব সৃষ্টি, এবং এই "কপালকুণ্ডলা"ই কাব্যাংশে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কারণ, ইহা বিশেষ কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য লইয়া লিখিত নহে। কাব্যের যাহা চরম লক্ষ্য,—নিরবচ্ছিন্ন বিমল সৌন্দর্য্য সৃষ্টি,—অত্যুন্নত, উদার, অনন্ত, অপূর্ব্ব, সুখ-কল্পনা-প্রসূতা স্বপ্নময়ী সৃষ্টি,—তাহা এই প্রকৃতি-পালিতা, সরলা, স্বভাব-সুন্দরীর চরিত্রচিত্রে প্রস্ফুটিত। সেই ভীষণ সাগর-উপকূলে, নবকুমারের সমক্ষে সর্ব্বপ্রথমে আমরা এই মোহিনীমূর্ত্তিটি দেখিতে পাই। অতি কোমল, অতি স্নিগ্ধ, অতি মধুরস্বরে কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে কহিল,—"পথিক, পথ ভুলিয়াছ?"

কোথায় এই স্বর, আর কোথায় সেই দুরন্ত কাপালিকের সেই বজ্রকঠোর ধ্বনি! কিন্তু সেই কঠোরতার সংসর্গেও, কপালকুণ্ডলার প্রকৃতির কমনীয়তা প্রস্ফুটিত।—এইটুকু কবির অসামান্য কৃতিত্ব ও কাব্য-কৌশল। এমনটি আর কোথাও দেখি নাই।—মিরন্দাই বল, শকুন্তলাই বল, আর যাহাই বল,—কপালকুণ্ডলার মত সৌন্দর্য্য-সুষমা-মণ্ডিতা, প্রকৃতি-পালিতা, সরলতাময়ী বালিকা, কৈ, আর কোথাও দেখি নাই। এ কুহকদুরিতপূর্ণ সংসারে এমন সৃষ্টি,—বড়ই মনোহারিণী,

বড়ই আত্মবিস্মৃতিকারিণী। ঘোর অদৃষ্টবাদী ও অন্তর্লীন-শক্তিসম্পন্ন দক্ষ ভাবুক চিত্রকর না হইলে, এমন চিত্র অঙ্কিত করা সম্ভবে না।

মিরন্দা বিজন-দ্বীপবাসিনী হইলেও, পিতাকে জানিত, পিতার স্নেহ পাইত, সংসারী-জীবের সুখ-দুঃখের মাত্রা বুঝিত।—শকুন্তলা নির্জ্জন তপোবনে পরিবর্দ্ধিতা হইলেও ঋষিকুমারী-গণের নিকট প্রায় সাংসারিক সকল অভিজ্ঞতাই লাভ করিয়া-ছিল।—কিন্তু এ, কি এ! এ যে বজ্রকঠোর-দৃঢ়তার পার্শ্বে প্রস্ফুটিত কমলিনী! তান্ত্রিকের তান্ত্রিক মূর্ত্তিমান্ কাপালিকের পার্শ্বে স্নেহ-মমতা-সরলতাময়ী ক্ষুদ্র বালিকা!—"কপালকুণ্ডলা" বঙ্কিমের চরমসৃষ্টি,—উৎকৃষ্ট কাব্যের উৎকৃষ্টতর সৃষ্টি। এ সৃষ্টির পার্শ্বে বঙ্কিমের অন্যান্য সৃষ্টি ধরিলে, ম্লান ও মলিন হইয়া যায়। শুধু কাব্যাংশে কেন,—নাট্যাংশেও "কপালকুণ্ডলা" বঙ্কিমের উৎকৃষ্ট সৃষ্টি।

অদৃষ্টবাদের উপর ভিত্তি স্থাপনই নাটকত্ব। সেই অদৃষ্টই কপালকুণ্ডলার অস্থি-মজ্জায় ও দেহে প্রাণে সর্ব্বত্র জড়িত। অদৃষ্টও প্রচ্ছন্ন, নাটকীয় ঘটনাপুঞ্জও প্রচ্ছন্ন।—দুই সুর এক হইয়া নাটক হয়। এই জন্যই হ্যামলেট সেক্সপিয়রের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ নাটক।

গ্রীক্ সাহিত্যের যত উৎকৃষ্ট কাব্য ও নাটক,—এই অদৃষ্ট-বাদের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া লিখিত; বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান গদ্যকাব্যও এই অদৃষ্টবাদে লক্ষ্য করিয়া লিখিত। অদৃষ্টের গতি যেমন স্বপ্নের ন্যায় কল্পনাপূর্ণা ও বৈচিত্র্যময়ী, কপালকুণ্ডলার সৃষ্টিরহস্যও তেমনই স্বপ্নের ন্যায় কল্পনা ও বৈচিত্র্য-জড়িত। সে

কল্পনা ও বৈচিত্র্য,—অনুভবনীয়, বুঝাইবার নহে। কপাল-কুণ্ডলার বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা হয় না।

এই গ্রন্থ লিখিয়া বঙ্কিম ধন্য হইয়াছেন; ভাবুক বাঙ্গালী পাঠককেও ধন্য করিয়াছেন। "কপালকুণ্ডলা" প্রকাশিত হইলে, সাহিত্য-সমাজে বঙ্কিমের বিশেষ প্রতিষ্ঠা হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "দুর্গেশনন্দিনী"তে বঙ্কিম যশোলাভ করিতে পারেন নাই,—অধিকন্তু বিলক্ষণ নিন্দাভোগ করিয়াছেন। কিন্তু "কপালকুণ্ডলা"য় তাঁহার যশশ্চন্দ্রের বিমল রশ্মি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এমন কি, বঙ্কিমের পূর্ব্বে যাঁহারা বঙ্গ-সাহিত্যের আসরে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, "কপালকুণ্ডলা" প্রকাশ হইলে, তাঁহাদের সেই প্রতিষ্ঠা শ্লথ হইয়া যায়,—কাহারও কাহারও গৌরবও লোপ হয়। সেই লুপ্ত-গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য,—বঙ্গের তদানীন্তন প্রধান নাটককার,—একেবারে দুইখানি নাটক যন্ত্রস্থ করেন।

কিন্তু বড় দুঃখে বলিতে হইতেছে,—এই অপূর্ব্বসৃষ্টি "কপালকুণ্ডলা"র পরেই, বঙ্কিমের "কাব্যের আদর্শ"—অপেক্ষাকৃত খাটো হইয়া যায়;—তাঁহার দুর্লভ "কবি-প্রতিভা" কিছু নামিয়া পড়ে। অসাধারণ যশঃ ও সম্মানলাভের ফলে, প্রতিভা-বান্ বঙ্কিম, যেন পাঠকের মনোরঞ্জনের দিকে একটু লক্ষ্য করিলেন।—কিসে পাঠকের ভাল লাগিবে, কিসে সাময়িক সুখ্যাতি হইবে,—কি উপায়ে ধর্ম্ম, নীতি, সংসার, সমাজ প্রভৃতি বড় বড় বিষয়ে প্রবেশলাভ করিয়া লোকশিক্ষকের উচ্চাসন লইবেন,—এই রকম সব বিষয় যেন তিনি মনে মনে নির্ব্বাচিত করিয়া, এক একখানি উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।—

কথাটা হঠাৎ কাহারও মনে ধরিবে না, বোধ হইতেছে। কারণ, বঙ্কিমের মধ্যস্তরের উপন্যাসগুলিই অধিকাংশ লোকের প্রিয়। একদিন আমাদেরও ইহা প্রিয় ছিল। এখন যে নাই, তাহা বলিতেছি না; তবে ততটা নাই। খাঁটী কাব্যের আদর্শ হিসাবে, নিছক সৌন্দর্য্যসৃষ্টি হিসাবে, আত্মবিস্মৃতি ও অন্তর্লীনতা হিসাবে,—এখন আর বঙ্কিমের মধ্যস্তরের উপন্যাসগুলি তেমন প্রিয় বোধ হয় না। পরন্তু চরিত্রাঙ্কন, লিপি-চাতুর্য্য ও ঘটনা-সমাবেশ,—এই সকল বিষয়ের আদর্শে, বঙ্কিমের দ্বিতীয় স্তরের উপন্যাসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ;—ইহা পূর্ব্বেরও ধারণা এবং এখনকারও ধারণা।

স্থানান্তরে বলিয়াছি,—বঙ্কিম মধ্যে মধ্যে পাঠককে কৈফিয়ৎ দিতে বসিয়াছেন। তাহার ফল যাহা হইবার হইল,—বঙ্কিম উচ্চতম "কাব্যের আদর্শ" হইতে এক সোপান নামিয়া পড়িলেন। অসাধারণ কবি বলিয়া বঙ্কিমের কবিত্ব ম্লান হইল না বটে; কিন্তু তাঁহার "কাব্যের আদর্শ" সুনিশ্চিত খাটো হইয়া গেল। বঙ্কিমের পরম ভক্ত হইলেও, সত্যের অনুরোধে ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। বুদ্ধিমান পাঠক, বঙ্কিমের এই মধ্যবয়সের উপন্যাসগুলি,—চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল প্রভৃতি,—একটু নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিয়া দেখিলে, আমাদের কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। ঐ সকল গ্রন্থের লেখার চটক খুব আছে বটে; স্থানে স্থানে কবিত্বও যথেষ্ট আছে বটে; কিন্তু মধ্যে মধ্যে লেখক যে, পাঠকের মুখের দিকে তাকাইয়াছেন এবং সুবিধা পাইলেই সঙ্গে সঙ্গে এক একটু কৈফিয়ৎও দিয়া গিয়াছেন, সে পক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

নিতান্ত আবশ্যক হইলে, কৈফিয়ৎ দেওয়া সমালোচকের কাজ; আবশ্যক না হইলে তাহাও নহে। বিশেষ বঙ্কিম বাবুর এই মধ্যস্তরের উপন্যাসগুলি,—প্রায়ই এক একটা "উদ্দেশ্য" লইয়া সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত।

'কাব্যের এককালে কোন উদ্দেশ্যই থাকিবে না',—অবশ্য, এমন কথা আমরা বলি না; পরন্তু দেখা চাই, সেই উদ্দেশ্য, একটা সীমাবদ্ধ ছোট উদ্দেশ্যে নিবদ্ধ কি না? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে,—সহস্র লিপিকুশলতা থাকিলেও,—কাব্যংশে সে গ্রন্থ নিশ্চয়ই ছোট হইবে। সংসার, সমাজ ও দেশ,—সংস্কৃত ও উন্নত করিতে কবির জন্ম বটে; পরন্তু সেই সংসার, সমাজ ও দেশ সংস্কৃত ও উন্নত করিবার ব্যপদেশে কবি যদি প্রতিক্ষণে পাঠকের মুখের পানে চান ও আত্মলক্ষ্য ছাড়িয়া তাহাদের মনোরঞ্জনের প্রতি লক্ষ্য রাখেন,—তাহা হইলে কি কবির নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়?—তাঁহার ধ্যান ও ধারণা-সম্ভূত যে মহাদর্শ, তাহা কি তিনি প্রকৃষ্টরূপে দেখাইবার অবসর পান?—আবার বলি, বঙ্কিমের পরমভক্ত হইলেও, সত্যের অনুরোধে বলিব, "কপালকুণ্ডলা"র পর—মধ্যস্তরের উপন্যাসে,—অন্যান্য বিষয়ের আদর্শে উৎকর্ষ দেখাইলেও, সৃষ্টি-চাতুর্যে এবং সৌন্দর্য্য-অবতারণায়,—বঙ্কিম "কাব্যের আদর্শ" হইতে এক সোপান নামিয়া গিয়াছেন।—হায়, "হাততালি!"

শেষাবস্থায় বুদ্ধিমান্ বঙ্কিম আপনার এ ভ্রম বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি সপ্তমে সুর চড়াইয়া, আদর্শের চরম পরাকাষ্ঠা দেখাইবার উদ্দেশ্যে,—স্বদেশ-ভক্তি, মানব-প্রীতি ও ঈশ্বরপ্রেম,—এই তিনটি পরমপদার্থকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাসরচনায় প্রবৃত্ত

হইলেন; তাহারই ফলে,—আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারামের সৃষ্টি হইল; এবং তাহারই ফলে, সাধারণ পাঠক শ্রী বা জয়ন্তী, প্রফুল্ল বা শান্তি, সত্যানন্দ বা মহাপুরুষের ধারণা করিতেও পারিল না;—বই পড়িতে হয়, তাই বঙ্কিমের মিষ্ট-লেখা-পূর্ণ নূতন নূতন বই আমোদভরে পড়িতে লাগিল।

কিন্তু হায়! আর ত সেই পূর্ব্বদিন নাই?—মধ্যাহ্নের সে প্রখর মার্ত্তণ্ড-প্রভা কমিয়া আসিয়াছে,—দিবা অবসানপ্রায়;—বঙ্কিমের তখন প্রৌঢ়াবস্থা। এ প্রৌঢ়াবস্থায় বাঙ্গালী বঙ্কিমের মনের উৎসাহ ও লেখার তেজ অবশ্যই কমিয়া আসিয়াছে। তাঁহার লিপিচাতুর্য্য ও সৌন্দর্য্যসৃষ্টির শক্তি অপেক্ষাকৃত নামিয়া পড়িয়াছে;—তাই সেই অপূর্ব্ব মহাদর্শ গ্রহণ করিয়াও বঙ্কিম পূর্ণমাত্রায় সফলকাম হইতে পারিলেন না।—তাঁহার মানস-সৌন্দর্য্যের হাট তখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে;—ফ'ড়ে ও দালালগণ তাঁহার সেই ভাঙ্গা-হাট নিজেদের বলিয়া সাব্যস্থ করিতে লাগিল, এবং তাহারই দুই একটা ভাঙ্গা দোকান-ঘর লইয়া একটু আধটু মেরামত করিয়া, নানা ছাঁদে নানা ফাঁদে "সাহিত্য বেসারে" প্রবৃত্ত হইল।—তাহাদের মূলধন নাই, পুজি-পাটা নাই,—কেবল বঙ্কিমের উচ্ছিষ্ট ধর্ম্মতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতা লইয়া, "পুরাতন বোতলে নূতন মদ" আমদানীর ন্যায়, তাহারা মহা সোরগোল আরম্ভ করিয়া দিল। সৌভাগ্যবশতঃ, তাহাদের সে চীৎকারে বাঙ্গালী পাঠকের স্বভাব-সুলভ সুখ-তন্দ্রা ভাঙ্গিল না, তাঁহারা যথারীতি চক্ষু মুদিয়া রহিলেন; আর বেগতিক বুঝিয়া সেই অবসরে পূর্ব্বোক্ত ফ'ড়ে ও দালালগণ আপন আপন দোকানপাট বন্ধ করিয়া বিষয়ান্তরে মনোযোগী হইল।

সত্যই, বঙ্কিমের মধ্যস্তরের উপন্যাসাবলীর লিখন-ভঙ্গিমা, রসমাধুর্য্য ও চরিত্র-চিত্র প্রভৃতি বড়ই মনোজ্ঞ। সেই মনোজ্ঞ ও মর্ম্মস্পর্শী লিপিকুশলতা এবং চরিত্রবিশ্লেষণের সেই অসাধারণ ক্ষমতা—যদি বঙ্কিমের শেষস্তরের উপন্যাসেও সমানভাবে থাকিত, তাহা হইলে, হয়ত বা "কপালকুণ্ডলা" অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট কাব্যাদর্শ আমরা দেখিতে পাইতাম;—দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইতাম। অপিচ, "কপালকুণ্ডলার" কাব্যাদর্শ,—বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর প্রভৃতির লিপিচাতুর্য্য ও চরিত্র-চিত্র,—এবং আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারামের মহালক্ষ্য যদি একত্র সন্নিবিষ্ট হইত, তাহা হইলে, বলিতে কি, বঙ্কিমের উপন্যাস—আজ সত্য সত্যই "জগতের উপন্যাস"-মধ্যে পরিগণিত হইত, এবং সমগ্র বাঙ্গালী জাতি আজ এক সোপান উচ্চে অবস্থিতি করিত। * কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা এবং প্রকৃতির নিয়ম নাকি অবশ্যম্ভাবী, তাই বঙ্কিম "কপালকুণ্ডলা" লিখিবার পর,—সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস লিখিতে বসিয়া এক সোপান নামিয়া পড়িলেন,—আর সেই অবসরে অদূরদর্শী পাঠক, লেখক ও সমালোচক,—মনের সাধে করতালি দিতে দিতে, কিছু কালের জন্য, সাহিত্যের সর্ব্বনাশ সাধন করিলেন।—হায়, সে সোণার বঙ্কিম কি আর মিলিবে?

সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস উৎকৃষ্ট নহে কেন, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

---

* বিষবৃক্ষ প্রভৃতি ভাষান্তরিত হইলেও, এবং দেখিতে দেখিতে তাহা ইউরোপের নানা ভাষায় ছড়াইয়া পড়িলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে এখনও তাহা "জগতের উপন্যাস" হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—সংসার, সমাজ ও দেশ সংস্কৃত ও উন্নত করিতেই কবির জন্ম। পরন্তু পাঠকের মনোরঞ্জনার্থ বা লোক-হিতার্থ কেবল এই তিনটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, কবি যদি অবিশ্রান্তভাবে লেখনী চালনা করেন, তাহা হইলে কবির প্রতিভা, মৌলিকতা ও আদর্শ ম্লান হইয়া যায়,—লেখা কতকটা একঘেয়ে হয়,—লেখায় আর পূর্ব্বের সেই মাদকতা ও উন্মাদিনী শক্তি থাকে না। সংসার, সমাজ ও দেশের হিতকথার জন্য,—এক খানা, দুই খানা, বড় জোর তিন খানা গ্রন্থ হয়;—তার পর যতই লিখ না কেন, সেই একই কথা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া থাকে। কারণ, নীতি-কথাগুলি এবং শাস্ত্রীয় শাসন ও উপদেশগুলি, যে সমাজেরই হউক না কেন,—মূল কথা সেই একটিমাত্র;—"জীবে দয়া, স্বার্থত্যাগ, ভক্তি ভগবানে।" হিন্দুর চরমগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও এই উপদেশ দেয়, মুসলমানের কোরাণও এই শিক্ষা দেয়, আর খৃষ্টানের বাইবেলও এই কথা বলে। তিন সম্প্রদায়ের এই তিন শাস্ত্রগ্রন্থ ছাড়িয়া,—তুমি কবি ও নীতিবেত্তা, তুমি আর কি নূতন উপদেশ দিবে? লোক-শিক্ষকের পদে তুমি আসীন হইয়াছ বটে, কিন্তু কেবলমাত্র ঐ শাস্ত্র এবং নীতি-কথা বলিতেই তোমার অভ্যুদয় হয় নাই,—ইহার সহিত তোমার আরও একটু কাজ আছে। সেই কাজটি অতি গুরুতর এবং সেই কাজটি সুসম্পন্ন করিবার জন্যই বিধাতা তোমাকে একটু স্বাতন্ত্র্য দিয়াছেন,—সাধারণ মানুষ হইতে তোমাকে একটু বিশেষত্বে রাখিয়াছেন। সেই স্বাতন্ত্র্য এবং বেশেষত্বটি,—তোমার নিজের হাতে। তুমি তাহার যথোচিত সদ্ব্যয় না করিলে, তোমাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে।

শাস্ত্রকথা এবং নীতি-উপদেশ আমার মাথার মণি বলিয়া মানি; পরন্তু তুমি কবি,—তুমি যদি সেই কাহিনী ফেনাইয়া, ফাঁপাইয়া, ফোলাইয়া, ভাণ করিয়া—নানা ছাঁদে, নানা ফাঁদে আমাকে রাতদিন বুঝাইতে আইস, তাহা হইলে তোমার কথা আমার ভাল লাগিবে কেন? আর মূল শাস্ত্র ছাড়িয়া তোমার ঐ "উদ্ধৃত" ও "সংক্ষিপ্ত" নীতিই বা আমি পড়িব কেন? তুমি কবি,—তুমি শাস্ত্র ও নীতিকে লক্ষ্য করিবে বটে, কিন্তু একমাত্র লক্ষ্য করিলে চলিবে না। সংসার, সমাজ ও দেশ সংস্কৃত এবং উন্নত করিবার জন্য আমার মহাগ্রন্থ "মনুসংহিতা" রহিয়াছে, "স্মৃতি" রহিয়াছে, "দায়ভাগ" রহিয়াছে,—আরও কতশত গ্রন্থ আছে,—আমি সেই আসল ছাড়িয়া তোমার নিকট নকল শাস্ত্র-কথা শুনিব কেন? ত্রিকালজ্ঞ ঋষি ছাড়িয়া তোমার নিকট সে সব তত্ত্ব জানিতে আমার প্রবৃত্তিই বা হইবে কেন?

তুমি কবি,—তুমি এমন জিনিস আমায় দাও,—যাহা আমার মনে ধরে; তুমি কবি,—তুমি এরূপভাবে মানব-চরিত্রের বিশ্লেষণ কর,—যাহার প্রতি আমার সহানুভূতি উদ্রিক্ত হয়; তুমি কবি,—তুমি এমনই ভাবে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি কর,—যাহাতে একাধারে আমার আনন্দ, প্রেম ও করুণা উছলিয়া উঠে; তুমি কবি,—তুমি এমনই ভাবে দেশ-কাল-পাত্রের সমন্বয় কর, —যাহাতে আমার ধর্ম্ম, চরিত্র ও মনুষ্যত্ব লাভ হয়; তুমি কবি, —তুমি এমনই কৌশলে ঘটনা সমাবেশ কর, যাহা পাঠে আমার ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হইতে পারে; তুমি কবি,—তুমি এমনই ভাবে প্রেমের প্রবাহ প্রবাহিত কর, যাহাতে আমার পাষাণপ্রাণও দ্রবীভূত হইয়া যায়; তুমি কবি,—তুমি

এরূপ আদর্শ ও আলেখ্য আমায় দেখাও,—যাহা দেখিতে দেখিতে আমি মন্ত্রমুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত হই;—আমার ক্ষুদ্রত্ব, মূঢ়ত্ব ও পশুত্ব ঘুচিয়া যায়;—আমি জগতকে আপনার জ্ঞান করিয়া,সকলকে ভালবাসিয়া, সেই চিদ্‌ঘন সচ্চিদানন্দকে চিনিতে পারি,—তাঁহার সত্বা সর্ব্বভূতে দেখিতে পাই; তুমি কবি—আর কত বলিব?—এক কথায় তুমি তোমার অতুল্য প্রতিভা-বলে আমার ইহকাল পরকাল উভয়দিকেরই পথ পরিষ্কার করিতে পার,—যদি সত্য সত্যই তোমার উচ্চতম আদর্শ থাকে,—সৃষ্টিশক্তি থাকে,—লিখিবার ক্ষমতা থাকে,—সৌন্দর্য্য দেখাইবার ও বিমল আনন্দ দিবার সৌভাগ্য থাকে! নীতি-উপদেশ দিবে;—দাও না ভাই? ভরপুর দাও না,—অবনত মস্তকে লইব; যাহা বলিবে শুনিব।—কিন্তু দোহাই তোমার, তুমি তোমার ঐ কটমট নীরস শুষ্ক নীতিকথা আমায় বলিও না!—ঐ মামুলি মান্ধাতা-আমলের চির-পুরাতন এক ঘেয়ে কাহিনী অমন করিয়া আওড়াইও না! উহা ত আমি শুনিবই না,—উপরন্তু, উহাতে তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধাও হইবে কি না, সন্দেহ।

ভাই, নীতিবেত্তা ও দার্শনিক! কবিকে মানি কেন শুনিবে? কবি আমার অন্তরঙ্গ,—হৃদয়ের সখা! আমার অন্তর বুঝিয়া, আমার হৃদয় দেখিয়া,—আপন তীক্ষ্ণ অনুভবক্ষম বিশাল হৃদয়ে বিশ্ববাসী নরনারীর বুকের ব্যথা স্থান দিয়া, ঠিক আমার মনের কথা মত আমারই ন্যায় তিনি মিষ্ট করিয়া বলেন;—সুগভীর সহানুভূতি ও করুণাকে আয়ত্ত করিয়া, বড় ভালবাসিয়া তিনি আমাকে ডাকিয়া কথা কন;—আমার মনের মত হইয়া আমার

সঙ্গে সঙ্গে চলেন ;—তাই কবিকে অত ভালবাসি ও মান্য করি! আরও মান্য করি কেন, শুনিবে ?—আমি পাপী, আমি তাপী, আমি দুঃখী,—আমি পৃথিবীর চক্ষে ধূলা-কুটার সামিল ;—কিন্তু মহাপ্রাণ কবি,—সেই আমাকে,—অবস্থা ও সময়ের উচ্চ কেন্দ্রে তুলিয়া, রাজ-রাজেশ্বর অপেক্ষা বড় করেন !—আমাকে আদর্শ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দেন।—এতই তাঁর গুণ ;—এমনই তিনি প্রেমময়!—আর তুমি দার্শনিক-নামধারী কঠোর নীতিবেত্তা,—ভাই! তোমাকে দেখিলেই যে, দূর হইতে নমস্কার করিতে আমার ইচ্ছা হয়! কি করিব বল, আমার মনের উপর ত তোমার হাত নাই ?

কথাটা খোলসা করিয়া বলিবার জন্যই, এমনভাবে আমাদিগকে লেখনীচালনা করিতে হইল। আশা করি, ইহার আর টীকা-টীপ্পনীর আবশ্যক হইবে না! ফল কথা, যাঁহারা সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাসের পক্ষপাতী, এবং প্রতিহাতে গজ-কাটী লইয়া "নীতির মাপ" লইতে উৎসুক,—তাঁহারা "কাব্যের আদর্শ" কি, ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। অন্ততঃ ইহাই আমাদের বিশ্বাস। ফল কথা, সীমাবদ্ধ নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যমূলক কাব্য বা উপন্যাস অধিক দিন স্থায়ী হয় না; তাহা সাময়িক ও সম্প্রদায় বিশেষের। "চিরকালের এবং সর্ব্বস্থানের সকল সম্প্রদায়ের" জন্য যে কাব্য, তাহাই উৎকৃষ্ট কাব্য এবং তাহারই অবতারণা করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। মহাকবি সেক্সপিয়র এই শ্রেণীর কাব্য লিখিয়াই অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। আর আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলা" ও ঐ "চিরকালের ও সকল স্থানের" কাব্য।—অপিচ,

এই "কপালকুণ্ডলা"তেই বঙ্কিম অমরত্বলাভ করিয়াছেন।

দেখ, উদ্দেশ্য সকল জিনিসেরই আছে। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যের পরিসর যদি সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রকৃত কাব্যের হিসাবে তাহার মূল্য বড় বেশী থাকে না। রামায়ণ যদি কেবলমাত্র নীতিগ্রন্থ হইত; মহাভারত যদি কেবলমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ হইত;—তাহা হইলে দেখিতে, পনেরো আনা লোক ঐ বিশাল গ্রন্থ দেখিয়া, ভয়ে পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িত! মহাকবিদ্বয় বুঝিয়াছিলেন, লোকশিক্ষা দিতে হইলে, এমনই ভাবে মানব ও জগতকে দেখিতে হইবে, যাহাতে সর্ব্বশ্রেণীর লোক সহজেই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।—পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া, সোণার শিশু মায়ের কোল আলো করিয়া, সোহাগভরে চাঁদকে ডাকিতে থাকে; আবার সেই পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া পরমপণ্ডিত দার্শনিকও ভাবাবেশে আকাশ-পাতাল ভাবিতে থাকেন। ভাল সকলেরই ভাল লাগে; সেখানে আর পণ্ডিত মূর্খে, শিশু বিজ্ঞে বেশী তফাৎ নাই। প্রকৃত কাব্যের সৌন্দর্য্যও এই পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়;—রং ফলাইয়া চিত্রটির সর্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্টি করিতে পারিলে তাহাতে সকলেই আকৃষ্ট হয়। তবে বুদ্ধিবশে ও শিক্ষাদোষে কাহারও বোধগম্য না হইলে বুঝিতে হইবে, সে দোষ মূলের নয়,—স্থুলের। পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া শিশু হাসে, ভাবুক আত্মবিস্মৃত হয়, নবদম্পতি প্রাণে প্রাণে কেলি করিতে থাকে,—নদী-হৃদয় গৌরবে স্ফীত হয়,—সকলেই উৎফুল্ল ও আনন্দিত হয় সত্য; কিন্তু সেই সময় দেখিবে, সারমেয়-কুল তারস্বরে চীৎকার করিতেছে! ইহা প্রাকৃতিক

নিয়ম। কাব্যের সৌন্দর্য্য-উপভোগও প্রাকৃতিক-নিয়ম-বহির্ভূত নয়।

আকাশ অনন্ত, সমুদ্রও অনন্ত। আকাশে মেঘ আছে, বৃষ্টি আছে, বিদ্যুৎ আছে, আরও কত কি আছে;—আকাশস্থ দ্রব্যের কি কেহ সংখ্যা করিতে পারে? তেমনই বিশাল সমুদ্রে —ঝড় আছে, আগুন আছে, বিষ আছে, রত্ন আছে,—কত অসংখ্য অগণিত পদার্থ আছে,—কে তাহার সংখ্যা করিবে? সব ছাড়িয়া দিয়া আকাশের ঐ নীলিমা আর মহাসমুদ্রের ঐ ধীর স্থির গভীর জলরাশির উদ্দেশ্য স্থির কর দেখি? আকাশস্থ ঐ নীলিমার "উদ্দেশ্য"-কাহিনী সহস্র লোক সহস্র প্রকারে ব্যাখ্যা করিবে, এবং সমুদ্রের ঐ অসীম নীলাম্বুর "উদ্দেশ্যের" কথাও সহস্র প্রকারে ব্যাখ্যাত হইতে পারে।—এখন সত্যই কি বিধাতা,—তোমার মনে ধরে,—এমনই একটিমাত্র উদ্দেশ্য স্থির করিয়া আকাশ ও সমুদ্র সৃষ্টি করিয়াছেন? না, আকাশ ও সমুদ্র অনন্ত-উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট। তুমি যেমন তোমার মন-অনুযায়ী একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধান্ত করিলে;—অসংখ্য অগণ্য মানুষও সেইরূপ তাহাদের স্ব স্ব ধারণানুযায়ী এক একটা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য স্থির করিবে,—এবং তাহাই করা স্বাভাবিক। অপিচ, আকাশ ও সমুদ্র দেখিয়া যে, সহস্র লোকের মনে সহস্রপ্রকার ভাবের উদয় হয়,—তাহাতেই না আকাশ ও সমুদ্র এত বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সৌন্দর্য্যময়?

উৎকৃষ্ট-কাব্য-সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। কাব্যের একটা কেন,—বিশটা—শতটা—সহস্রটা উদ্দেশ্য থাকিবে, এবং তাহাই থাকা বাঞ্ছনীয়;—পরন্তু কবি যদি একমাত্র উদ্দেশ্য সম্বল করিয়া,

ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই উদ্দেশ্যের গণ্ডীটির মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, তাঁহার "কাব্যের আদর্শ" নামিয়া পড়ে না কি? বেশ ত, উদ্দেশ্যমূলক কাব্য বা উপন্যাসই লিখ না? কিন্তু তাহা ঐ আকাশ ও সমুদ্রের মত অনন্ত উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট উদার ও বৈচিত্র্যময় হওয়া চাই। নহিলে আমরা তাহার প্রতি বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিব কেন? এমন হইলে তবে ত "কাব্যের আদর্শ" ঠিক থাকিবে? তবে ত তাহা দেখিতে দেখিতে, ভাবুক অসীম ভাবসমুদ্রে ডুবিয়া আত্মবিস্মৃত হইবেন? যদি তাহা না হয়, তবে আমি তোমার কাব্যকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া গণ্য করিতে পারিব না।

বঙ্কিমকে বড় ভালবাসি ও ভক্তি করি বলিয়া, তাঁহার দ্বিতীয় স্তরের উপন্যাসের,—কাব্যাদর্শ-ন্যূনতার কথা এরূপভাবে উল্লেখ করিলাম; পরন্তু তৎসঙ্গে, উৎকৃষ্ট-কাব্য-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কি, সে কথাও একটু বলিলাম। এখন কপালকুণ্ডলার এক স্থান হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া, আমরা এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

পাঠক, কুলীনপত্নী শ্যামাসুন্দরীর সহিত কপালকুণ্ডলার কথোপকথন একটু শুনুন;—

"শ্যামাসুন্দরী। ভাল, আমার সাধটী পূরাও। একবার আমাদের গৃহস্থের মেয়েদের মত সাজ। কত দিন যোগিনী থাকিবে?

"মৃণ্ময়ী। যখন এই ব্রাহ্মণ-সন্তানের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, তখন ত আমি যোগিনীই ছিলাম।

"শ্যা। এখন আর থাকিতে পারিবে না।

"মৃ। কেন থাকিব না?

"শ্যা। কেন? দেখিবি? তোর যোগ ভাঙ্গিব। পরশ-পাথর কাহাকে বলে জান?

"মৃ। না।

মৃণ্ময়ী কিছুতেই গৃহস্থের মেয়েদের মত হইতে চাহে না।

"শ্যা। বল দেখি, ফুলটী ফুটিলে কি সুখ?

"মৃ। লোকের দেখে সুখ; ফুলের কি?"

সমালোচক বঙ্কিম এই অবসরে একটু সমালোচনা করিয়া লইলেন;—"ফুলের ফুটিয়াই সুখ। পুষ্পরস, পুষ্পগন্ধ বিতরণই তাহার সুখ। আদান প্রদানই পৃথিবীর সুখের মূল, দ্বিতীয় মূল নাই।"

"শ্যা। আচ্ছা, তাই যদি না হইল,—তবে শুনি দেখি, তোমার সুখ কি?

"মৃ। (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) বলিতে পারি না। বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।"

দেখিলে পাঠক, প্রকৃতি-পালিতা কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি! প্রকৃতির মুক্তপ্রাঙ্গণে যে পরিবর্দ্ধিতা, তাহাকে কি গৃহস্থের মেয়েদের মত ঘরে রাখিতে পার? বন-বিহঙ্গিনী বনে থাকিয়াই সুখী;—তাহাকে সুবর্ণ-পিঞ্জরে পূরিয়া রাজভোগে রাখিলে কি, সে সুখী হইতে পারে?

পুনশ্চ;—

"শ্যা। এখন ফিরিয়া যাইবার উপায়?

"মৃ। উপায় নাই।

"শ্যা। তবে করিবে কি?

"মৃ। অধিকারী কহিতেন, "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"! যাহা বিধাতা করাইবেন, তাহাই করিব। যাহা কপালে * আছে, তাহাই ঘটিবে।

"শ্যা। কেন, কপালে আর কি আছে? কপালে সুখ আছে—তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল কেন?"

এইবার মৃণ্ময়ী ভবানী-পাদপদ্মে সেই 'ত্রিপত্র' অর্পণের কথা বলিল। মা তাহা গ্রহণ করেন নাই, তাহাও বলিল। তাই মৃণ্ময়ী কহিল, "কপালে কি আছে, জানি না।"

"মৃণ্ময়ী নীরব হইলেন। শ্যামাসুন্দরী শিহরিয়া উঠিলেন।"

দেখিলেন পাঠক, কবির কৌশল?

এই অপূর্ব্ব বিয়োগান্ত কাব্যেরও আবার উপসংহার (Sequel) "মৃণ্ময়ী" বাহির হয়! সে মৃণ্ময়ী আবার পুনর্জ্জীবিতা হইয়া সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিল। হা অদৃষ্ট!

তাই পাঠক ও লেখকের রুচি প্রবৃত্তি ও বিচার-বুদ্ধি দেখিয়া সহজেই উপলব্ধি হয়, "কপালকুণ্ডলা" এদেশের অতি অল্প লোকেই বুঝিয়াছে। 'কপালকুণ্ডলা' চিত্রটি যে, একখানি অতি অপূর্ব্ব বিয়োগান্ত কাব্যে পরিণত হইবে, তাহা ত ভবানী-পাদপদ্মে বিল্বপত্র-দান হইতেই সহজে বোধগম্য হয়?—কবি

* দেখুন পাঠক, সেই অদৃষ্টবাদের কথাই ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। এইজন্যই বলিতে হয়, এই অপূর্ব্ব রহস্যপূর্ণ সৌন্দর্য্যময় কাব্যখানি একাধারে কবিত্ব ও নাটকত্বে পরিপূর্ণ;—ইহা কবির চরম সৃষ্টি। কপালকুণ্ডলার চারিপার্শ্বেই অদৃষ্টের প্রচ্ছন্ন ক্রীড়া। প্রতিভাবান্ চিত্রকর সামান্য দুই চারিটি রেখাপাতে, সে ক্রীড়া অতি দক্ষতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন।

ত পূর্ব্ব হইতেই সে ইঙ্গিত দিয়া রাখিয়াছেন! ইহা সত্ত্বেও তাহার "উপসংহার" হইল! তাই বুঝি বঙ্কিম বাবু বড় দুঃখে, পরবর্ত্তী সংস্করণে,—'কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার নদীজলে ডুবিয়া মরিল',—এইরূপ একটা অতি স্থূল কথাও খুলিয়া লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন! হায়, পাঠক-সমাজ!

১০

"কপালকুণ্ডলা"র এত প্রাধান্য আমরা দিলাম বটে, কিন্তু বঙ্কিম বাবু নিজে তাঁহার "কৃষ্ণকান্তের উইল"কে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিতেন। অপিচ, লিপি-কুশলতা, চরিত্র-চিত্র, ভাষার পারিপাট্য, সূক্ষ্মদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার একথা ঠিক বটে। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত "কাব্যের আদর্শ" হিসাবে, কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস নহে,—কপালকুণ্ডলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাই হোক্, "কৃষ্ণকান্তের উইল" যে একখানি উচ্চাঙ্গের উপন্যাস, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বোধ হয়, বঙ্কিম বাবুর আর কোন গ্রন্থ এত সতর্কতার সহিত,—এত আড়ম্বর-হীনতার সহিত লিখিত নয়। ইহার ঘটনা অতি সামান্য। পরন্তু সেই সামান্য ঘটনা হইতে কবি মানব-চরিত্রের যে, কি সুন্দর বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা ভ্রমর, গোবিন্দলাল, রোহিণীকে ভাল করিয়া না দেখিলে বুঝা যায় না। একদিকে যেমন চরিত্রসৃষ্টি, অপর দিকে আবার তেমনই নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত। সংসার ও সমাজ-সম্বন্ধে, এই গ্রন্থখানি বঙ্কিমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস;—"বিষবৃক্ষে"র স্থান ইহার নিম্নে।

মূল চরিত্র ইহাতে তিনটি;—গোবিন্দলাল, ভ্রমর ও

রোহিণী। প্রেমে ও কামে সংঘর্ষণই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। একদিকে দাম্পত্য প্রেম—অতি মধুর ও পবিত্র; অন্যদিকে রূপজমোহে উন্মত্ততা।—দেবচরিত্র গোবিন্দলাল পাপিষ্ঠা রোহিণীর জন্য সোণার সংসার ছারখার করিল;—পতিপ্রাণা, সতীসাধ্বী, ভালবাসার মূর্ত্তিমতী প্রতিমা সোণার ভ্রমরের অকাল-মৃত্যুর কারণ হইল। অভিমানিনী—পতিপ্রেমে অভিমানিনী—ধর্ম্মবলে অভিমানিনী ভ্রমর মরিয়া জুড়াইল।

আমরা দুই এক স্থল হইতে একটুমাত্র উদ্ধৃত করিয়া ভ্রমর-চরিত্রের একটু আভাস দিব;—

কৃষ্ণকান্ত রায়ের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে,—দেবতার মন্দিরে পাপ প্রবেশ করিয়াছে,—ভ্রমরের কপাল পুড়িয়াছে,—এমন সময়ে গোবিন্দলালের মাতা কাশীবাসের ইচ্ছা করিলেন। অধঃপতিত গোবিন্দলালও এখন তাই চায়,—গোবিন্দলালও মাতার সঙ্গে যাইবে। * ভ্রমর স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। পোড়া কপাল আরও পুড়িতে চলিল।—পাপ রোহিণী তাহার সুখের পথে কাঁটা দিয়াছে!

গোবিন্দলাল বলিল, "আমি চলিলাম।

"ভ্রমর। কবে আসিবে?

"গোবিন্দলাল। আসিব না।'

"ভ্র। কেন? আমি তোমার স্ত্রী, শিষ্যা, আশ্রিতা, প্রতিপালিতা,—তোমার দাসানুদাসী,—তোমার কথার ভিখারী,—আসিবে না কেন?

---

* এইটি কবির অতি সহজ-সুন্দর-স্বাভাবিক নাট্যকৌশল।—এইরূপ কৌশল কৃষ্ণকান্তের উইলের অনেক স্থানে আছে। তাই বলিতে হয়, এই গ্রন্থের মুন্‌সিয়ানা বড়ই সতর্কসূচক অথচ আড়ম্বরহীন।

"গো। ইচ্ছা নাই।

"ভ্র। ধর্ম্ম নাই কি?

"গো। বুঝি আমার তাও নাই।

"বড় কষ্টে ভ্রমর চক্ষের জল রোধ করিল;—হুকুমে চক্ষের জল ফিরিল,—ভ্রমর যোড়হাত করিয়া অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল,- "তবে যাও-পার, আসিও না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর!—কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও, একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও—একদিন তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায়? একদিন তুমি বলিবে—আবার দেখিব ভ্রমর কোথায়? দেবতা সাক্ষী,—যদি আমি সতী হই, যদি কায়মনোবাক্যে তোমার প্রতি আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল, যে, আর আসিবে না। কিন্তু আমি বলিতেছি,—আবার আসিবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আবার আমার জন্য কাঁদিবে। যদি এ কথা নিষ্ফল হয়, তবে জানিও—দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী। তুমি যাও, আমার দুঃখ নাই। তুমি আমারই—রোহিণীর নও।"

বড় শক্ত কথা। একদিকে স্বামীর প্রতি গভীর প্রেম ও ভালবাসা, অন্যদিকে দারুণ ধর্ম্মের অভিমান *,—পতি হইতে কতকটা স্বাতন্ত্র্য ভাব।—ভ্রমর কি আদর্শ হিন্দু-রমণী?

---

* এই ধর্ম্মের অভিমানেও ঈর্ষা আছে। অভিমান—অভিমান।—তা ধর্ম্মেরই হোক্, আর অধর্ম্মেরই হোক্। এ বিষ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

আর একস্থান দেখ ;—ভ্রমর অন্তিম-শয্যায় শায়িতা ; পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে স্বামীকে দেখিবার জন্ম ভগিনীর নিকট কত আক্ষেপ-অনুতাপ করিতেছিল। * * * এখন সেই ভ্রমর আপন "কর-তলের নিকট স্বামীর চরণ পাইয়া সেই চরণযুগল স্পর্শ করিয়া, পদরেণু লইয়া মাথায় দিল। বলিল, "আজ আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন সুখী হই।"

ভ্রমর কি আদর্শ হিন্দু-রমণী ?

দুর্জ্জয় অভিমানে, ভ্রমর ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে স্বামীকে পত্র লিখিতে, ইচ্ছা করিয়া 'সেবিকা' পাঠ লিখে নাই। স্বামীর সকল অবস্থাতেই স্ত্রী সেবিকা ;—অথচ ভ্রমর সে পাঠ লিলখি না।—ভ্রমর কি আদর্শ হিন্দুরমণী ?

অন্যত্র ;—স্বামী গোবিন্দলালকে উদ্দেশ করিয়া ভ্রমর লিখিতেছে ;—"যত দিন তুমি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলে, ততদিন তোমাকে শ্রদ্ধা করিয়াছি।" (আর এখন ?)—ভ্রমর কি আদর্শ হিন্দু-রমণী ?

গোবিন্দলাল যখন সর্ব্বস্বান্ত হইয়া—অন্ন-বস্ত্রের কাঙ্গাল হইয়া, ভ্রমরের নিকট আপন দুরবস্থার বিষয় জ্ঞাপন করিল,—যাহাতে অতি বড় অধমের প্রাণও খিগলিত হয়,—ভ্রমর তখনও স্বামীর পানে চাহিল না ;—তখনও সে অবিচলিতা,—তখনও তাহার অভিমানের মাত্রা সমান।—যেরূপ অবস্থায় পথের পথিকেরও দয়া হয়—শত্রুরও সহানুভূতি হয়, সেরূপ অবস্থায়ও হিন্দুর মেয়ে ভ্রমরের অভিমানের বেগ কমিল না,—স্বামীর উপর রাগ পড়িল না।—ভ্রমর কি আদর্শ হিন্দু-রমণী ?

পরম শ্রদ্ধাস্পদ ও প্রসিদ্ধ সমালোচক স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ভ্রমর-চরিত্রের সমালোচন উপলক্ষে ভ্রমরকে একটি অতি উচ্চাঙ্গের হিন্দুরমণী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই মর্ম্মে বলিয়াছেন,—ভ্রমর-চরিত্রের এ রহস্য (ধর্ম্মের অভিমান) বুঝি, দেব-বুদ্ধিরও অবোধ্য।*—কিন্তু কথাটা কি ঠিক ?

বসুজ মহাশয় সূর্য্যমুখীর পার্শ্বে ভ্রমরকে রাখিয়া, "দুইটি হিন্দুপত্নী"-শীর্ষক প্রবন্ধে এই কথা সাব্যস্থ করিয়াছেন। বসুজ মহাশয়ের লেখার আমি একজন পরম ভক্ত হইলেও, উপস্থিত বিষয়ে তাঁহার সহিত এক-মত হইতে পারিলাম না। ভ্রমর যে ইচ্ছা করিয়া স্বামীকে 'সেবিকা' পাঠ লিখিল না—পরন্তু লিখিল, "যতদিন তুমি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলে, ততদিন তোমাকে শ্রদ্ধা করিয়াছি" এবং মৃত্যুকালেও স্বামীকে বলিল,—"আশীর্ব্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন সুখী হই"—ইহাতে তাহাকে উচ্চাঙ্গের 'হিন্দু-রমণী' অর্থাৎ "আদর্শ" হিন্দু-রমণী বলিব কিরূপে ?

তবে মহামতি বেকন বলেন যে, সতী স্ত্রীর একটা দুর্জ্জয় অভিমান থাকা খুব স্বাভাবিক ; -সে অভিমান ঠিক অভিমান নহে,—সতীত্বের আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান !

হউক 'সতীত্বের আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান'—হিন্দু-স্ত্রীর আদর্শ, —ভ্রমর কিছুতেই হইতে পারে না, পারিবেও না। এটা খাঁটি ইউরোপীয় ভাব। সীতা-সাবিত্রীর দেশের হিন্দু-রমণীর এ অভিমান সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

আদর্শ হিন্দু-রমণীর কথা,—"আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্মান্তরে তোমাকে স্বামী পাই"—অথবা "তোমার মত স্বামী পাই !"—

* "দুইটি হিন্দুপত্নী"—ত্রিধারা

"জন্মান্তরে যেন সুখী হই"—হিন্দু-রমণী কখন এমন কথা বলিতে পারে না। আর বলিতে পারে না যে,—"যত দিন তুমি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলে, ততদিন তোমায় শ্রদ্ধা করিয়াছি!"—তা ভ্রমর, এখন কি করিবে?—গোবিন্দলাল ত এখন মাতাল, কুলটাসক্ত, ঘোর অধঃপতিত;—তা এখন তুমি কি করিতে চাও?

হায়, গৃহলক্ষ্মী বঙ্গললনাকুল! অতি-বড়-শত্রুও যেন তোমাদিগকে এরূপ পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম শিক্ষা না দেয়। তোমরা সেই সীতা-সাবিত্রীর যুগ হইতে যে ভাবে পতিপূজা ও পতিপ্রেম শিখিয়া আসিতেছ, চিরদিন সেই ভাবে উহা শিখিতে থাক। তাহা হইলেই আমাদের গৃহ উজ্জ্বল থাকিবে। দেবি! সত্য বলিতে কি,—তোমাদের গুণেই আজও আমরা মানুষ আছি! তোমাদের শিক্ষাও যেমন অপূর্ব্ব, তোমাদের প্রেমের গভীরতাও তেমনই অপূর্ব্ব। তোমরা যে পতি ভিন্ন অন্য দেবতা জান না! তাহা যে, জানিতেও নাই! পতি গুণবান্ হউন বা নিগুর্ণ হউন; সুন্দর হউন বা কুৎসিত হউন; ধনী হউন বা দরিদ্র হউন;—তিনি যে তোমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা! তবে যে তোমরা অন্য দেবতার অর্চ্চনা কর, বার ব্রত কর, উপবাস ও মানসিক কর, সে তোমাদের নিজের জন্য নহে,—পতির মঙ্গলার্থে। তোমার মঙ্গলামঙ্গল,—তোমার ইহকাল-পরকাল,—সকলই তোমার পতি-দেবের চরণে উৎসৃষ্ট। হিন্দুকুললক্ষ্মীগণ! এই ভাবটি অনুক্ষণ হৃদয়ে জাগরূক রাখিও। আর তোমাদের প্রিয় কবিও তাহা তোমাদিগকে স্থানান্তরে পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

জয়ন্তী ও শ্রীর সেই অপূর্ব্ব কথোপকথনটি স্মরণ করুন;—

"শ্রী। স্ত্রীলোকের পুণ্য একমাত্র স্বামিসেবা। যখন তাই ছাড়িয়া আসিয়াছি, তখন আবার আমার পুণ্য কি আছে?

"জয়ন্তী। স্বামীর একজন স্বামী আছেন।

"শ্রী। তিনি স্বামীর স্বামী—আমার নন। আমার স্বামীই আমার স্বামী—আর কেহ নহে।

"জয়ন্তী। যিনি তোমার স্বামীর স্বামী, তিনি তোমারও স্বামী,—কেন না, তিনি সকলের স্বামী।

"শ্রী। আমি ঈশ্বরও জানি না, স্বামী জানি।

"জয়ন্তী। জানিবে? জানিলে এত দুঃখ থাকিবে না।

"শ্রী। না। স্বামী ছাড়িয়া আমি ঈশ্বরও চাহি না। আমার স্বামীকে আমি ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমার যে দুঃখ, আর ঈশ্বর পাইলে আমার যে সুখ, ইহার মধ্যে আমার স্বামি-বিরহ-দুঃখই আমি ভাল বাসি।

"জয়ন্তী। যদি এত ভাল বাসিয়াছিলে—তবে ত্যাগ করিলে কেন?

"শ্রী। আমার কোষ্ঠীর ফল শুনিলে না? কোষ্ঠীর ফল শুনিয়াছিলাম।

"জয়ন্তী। এত ভাল বাসিয়াছিলে কিসে?

"শ্রী তখন সংক্ষেপে আপনার পূর্ব্ব বিবরণ সকল বলিল। শুনিয়া জয়ন্তীর চক্ষু একটু ছল ছল করিল। জয়ন্তী বলিল,—

"তোমার সঙ্গে তাঁর ত দেখা সাক্ষাৎ নাই বলিলেও হয়,—এত ভালবাসিলে কিসে?

"শ্রী। তুমি ঈশ্বর ভালবাস,—কয়দিন ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছে?

"জয়ন্তী। আমি ঈশ্বরকে রাত্রি দিন মনে মনে ভাবি।

"শ্রী। যে দিন বালিকা বয়সে তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে দিন হইতে আমিও তাঁহাকে রাত্রিদিন ভাবিয়াছিলাম।

"জয়ন্তী শুনিয়া রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া উঠিল। শ্রী বলিতে লাগিল,—

"যদি একত্রে ঘর-সংসার করিতাম, তাহা হইলে বুঝি এমনটা ঘটিত না। মানুষ মাত্রেরই দোষগুণ আছে। তাঁরও দোষ থাকিতে পারে। না থাকিলেও আমার দোষে আমি তাঁর দোষ দেখিতাম। কখন না কখন, কথান্তর, মনভার, অকুশল ঘটিত। তাহা হইলে এ আগুন জ্বলিত না। কেবল মনে মনে দেবতা গড়িয়া তাঁকে আমি এত বৎসর পূজা করিয়াছি। চন্দন ঘসিয়া, দেয়ালে লেপন করিয়া মনে করিয়াছি, তাঁর অঙ্গে মাখাইলাম। বাগানে বাগানে ফুল চুরি করিয়া তুলিয়া, দিনভোর কাজকর্ম্ম ফেলিয়া, অনেক পরিশ্রমে মনের মত মালা গাঁথিয়া, ফুলময় গাছের ডালে ঝুলাইয়া মনে করিয়াছি, তাঁর গলায় দিলাম। অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া, ভাল খাবার সামগ্রী কিনিয়া, পরিপাটী করিয়া রন্ধন করিয়া, নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া মনে করিয়াছি, তাঁকে খাইতে দিলাম। ঠাকুর প্রণাম করিতে গিয়া, কখন মনে হয় নাই যে, ঠাকুর প্রণাম করিতেছি,—মাথার কাছে তাঁরই পাদপদ্ম দেখিয়াছি। তারপর জয়ন্তী—তাঁকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। তিনি ডাকিলেন, তবু ছাড়িয়া আসিয়াছি।

"শ্রী আর কথা কহিতে পারিল না, মুখে অঞ্চল চাপিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল।" *

স্থানান্তরে, ভবানীপাঠকের শিষ্যা নিশা প্রফুল্লকে বুঝাই-তেছে,—"শ্রীকৃষ্ণই আমার স্বামী। যিনি সম্পূর্ণ আমাতে অধিকারী, তিনিই আমার স্বামী।"

প্রফুল্ল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "বলিতে পারি না। —কখন স্বামী দেখ নাই, তাই বলিতেছ।—স্বামী দেখিলে শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না।"

অন্যত্র,—

"গৃহধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম; রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসার-ধর্ম্ম। ইহার অপেক্ষা কোন যোগও কঠিন নয়। দেখ, এই এতগুলি নিরক্ষর, স্বার্থপর, অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের কাহারও কোন কষ্ট না হয়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এর চেয়ে কোন্ সন্ন্যাস কঠিন? এর চেয়ে কোন্ পুণ্য বড় পুণ্য? আমি এই সন্ন্যাস করিব।" †

হিন্দুর রমনীর স্বামীর আদর্শ এইরূপ:—নিখিল-স্বামী অপেক্ষাও বিবাহ-সূত্রে-আবদ্ধ স্বামী হিন্দুরমণীর নিকট বড়। স্বামীর প্রতি এইরূপ ধারণা আছে বলিয়াই, হিন্দু-রমণী—

* সীতারাম।

† নিষ্কাম ধর্ম্মতত্ত্বে অভিজ্ঞা প্রফুল্ল গৃহে ফিরিয়াছে; স্বামিচরণ-পূজাই স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্ম বুঝিয়া ফিরিয়াছে। সেই প্রফুল্ল সংসারীকে—বিশেষ পতিযুক্তা সাধ্বী রমণীবৃন্দকে এই শিক্ষা দিতেছে।—"দেবী চৌধুরাণী।"

"দেবী" "লক্ষ্মী" "মা" প্রভৃতি উচ্চ সম্বোধনে অভিহিত হন।

তবে বঙ্কিম বাবু যদি ইচ্ছা করিয়াই,—ধর্ম্মবলে অভিমানিনী একটি স্ত্রীচরিত্র আঁকিতে গিয়া থাকেন এবং তাহার ফলে ভ্রমরের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তাহা ঠিকই হইয়াছে। অর্থাৎ স্ত্রী সহস্রগুণে গুণবতী হইলেও যে, এক অভিমানের বিষে,—বিশেষ সে বিষের প্রভাব স্বামীকেও অবধি সহিতে হইলে যে, সকলই পণ্ড হয়,—সোণার সংসার ছারখার যায়,—ইহা খুব খাঁটী কথা। ধর্ম্মেরই হউক আর অধর্ম্মেরই হউক,—অভিমান অভিমান—ও বিষ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। ভ্রমর যদি একটু নরম হইয়া স্বামীকে সুপথে আনিতে চেষ্টা করিত, তবে বুঝি সকল দিক্‌ই বজায় থাকিত। কিন্তু কবির ত তাহা দেখান উদ্দেশ্য নয়,—ধন্বন্তরির পরিপূর্ণ সুধাভাণ্ডে এক বিন্দু কালকূট থাকিলেও যে কি হয়,—ভ্রমরের দুর্জ্জয় ধর্ম্মের অভিমানে—কবি তাহাই দেখাইয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে স্পষ্টরূপে বড় গলা করিয়া বলা যায়,—ভ্রমর হিন্দুরমণীর আদর্শ নহে।

ইদানীং বঙ্কিম বাবুর প্রায় সকল মতই পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছিল। ইদানীং প্রায় সকল উপন্যাসেরই নূতন সংস্করণের উপসংহারটা তিনি উল্‌টাইয়া নূতন করিয়া লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাহার ফল ভাল কি মন্দ, বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী তাহার বিচার করিবেন। তবে আমাদের একটা কথা মনে হয়, এরূপ ভাবে উপসংহার করিলে, গ্রন্থের আমূল পরিবর্ত্তন ও সংস্কার করা আবশ্যক। নচেৎ কোন মৃত নায়ককে বাঁচাইয়া বা জীবিত নায়ককে মারিয়া বা সন্ন্যাসী করিয়া ছাড়িয়া দিলে,

মূলগ্রন্থের সঙ্গতি রক্ষা হয় না। এই "কৃষ্ণকান্তের উইলের" নূতন সংস্করণেই তাঁহার প্রমাণ দেখুন না? নূতন সংস্করণে বঙ্কিম বাবু গোবিন্দলালকে বাঁচাইয়া, জটাজূটধারী সন্ন্যাসী করিয়া, ভ্রমরের সুবর্ণময়ী মূর্ত্তি দেখাইলেন এবং তার পর গোবিন্দলালের মুখ দিয়া দুটা তত্ত্বকথা শুনাইলেন। আমাদের বিবেচনায় এটি উৎকৃষ্ট কাব্য-কৌশল নহে।

মানব-চরিত্রের অভিজ্ঞতায় বঙ্কিম পরম পণ্ডিত। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি এত সূক্ষ্ম ও সুদূরগামিনী যে, তাঁহার কোন উপন্যাসের —কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ—সকল চরিত্রেই তাহা,—সামান্য দুই একটি রেখাপাতে উজ্জ্বলরূপে প্রস্ফুটিত। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ইহার যথেষ্ট নিদর্শন আছে।

"বিষবৃক্ষে"ও বঙ্কিমের কম গুণপনা প্রকাশ পায় নাই। সেই সতী-প্রতিমা "সূর্য্যমুখী" ও সুহাসিনী আনন্দরূপিণী "কমল-মণি" চিরদিন বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে। অধিকন্তু 'বিধবা-বিবাহ'রূপ বিষ যে, পবিত্র হিন্দু-সমাজে স্থান পাইতে পারে না, তাহা সেই কুসুম-কোমল-কমনীয় 'কুন্দ'-চরিত্রে প্রকটিত। পরন্তু হিন্দু-বিধবার দুঃখে যে, কিরূপে কাঁদিতে ও কাঁদাইতে হয়, তাহা "মুখ ফুটিল" পরিচ্ছেদে কবি বড় মিঠা-হাতে দেখাইয়াছেন।

আর সেই আদর্শ হিন্দুপত্নী সূর্য্যমুখীর পতি-প্রেম?—সূর্য্য-মুখী কমলমণিকে পত্র লিখিতেছেন,—"আশীর্ব্বাদ করি, স্বামীকে লইয়া তুমি সুখী হও। আরও আশীর্ব্বাদ করি, যেদিন তুমি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইবে, সেই দিন যেন তোমার আয়ুঃশেষ হয়,—আমায় এ আশীর্ব্বাদ কেহ করে নাই।"

কি মর্ম্মচ্ছেদকরী উক্তি! উপরিলিখিত ঐ একটিমাত্র কথায় যেন বুকের অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া যায়!—"যেদিন স্বামীর সুখে বঞ্চিত হইবে, সেই দিন যেন তোমার আয়ুঃশেষ হয়,—আমায় এ আশীর্ব্বাদ কেহ করে নাই।" এই একটিমাত্র কথায় হৃদয় কি সুন্দর পরিব্যক্ত হইয়াছে!

সূর্য্যমুখী যথার্থই আদর্শ হিন্দুপত্নী! তবে যে তিনি দু'দিনের জন্য স্বামীকে ফেলিয়া পলাইয়াছিলেন,—সেটা অভিমানবশে নয়,ভ্রমরের মত অভিমানিনী বলিয়াও নয়,—সেটা কেবল নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য এবং অপরিণামদর্শিতা। মূলে সূর্য্যমুখী ঠিক আছে।

আর সেই হতভাগ্য অসংযমী নগেন্দ্রনাথ—যখন নেশার ঘোর কাটিল, রূপের মোহ ঘুচিল, জ্ঞানচক্ষু ফুটিল,—সূর্য্যমুখীর কল্পিত মৃত্যুসংবাদে হতভাগ্য নগেন্দ্র তখন উন্মত্তপ্রায় হইল। মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া কহিল,—"আমি সূর্য্যমুখীর বধকারী—কে এমন পিতৃঘ্ন, মাতৃঘ্ন, পুত্রঘ্ন আছে,যে আমা অপেক্ষা গুরুতর-পাপী? সূর্য্যমুখী কি কেবল আমার স্ত্রী? সূর্য্যমুখী আমার সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী। আমার সূর্য্যমুখী—কাহার এমন ছিল? * * * আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ।—আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পুণ্য। আমি শূকর, রত্ন চিনিব কেন?"

লোকশিক্ষক বঙ্কিম এইরূপে হিন্দুদম্পতীর সম্বন্ধ বুঝাইলেন।

সত্যের অনুরোধে তথাপি বলিব, এখন বঙ্কিম যে পরিমাণে নীতিকার, সে পরিমাণে কবি নন।—এই হিসাবে আমরা বঙ্কিমকে, তাঁহার দ্বিতীয় স্তরের উপন্যাসে "কাব্যের আদর্শ" হিসাবে,—এক সোপান নিম্নে নামিয়া পড়িয়াছেন, বলিয়াছি; —বিচক্ষণ পাঠক কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ প্রভৃতির এই সব স্থান একটু লক্ষ্য করিয়া পড়িবেন। যাই হোক্,বিষবৃক্ষের "কুন্দ-নন্দিনীর" চিত্রটি অতি সুন্দর। এই কুন্দ, কপালকুণ্ডলা, রমা ও তিলোত্তমার,—প্রকৃতিগত একটু সাদৃশ্য আছে। ইহারা বেশী কথা জানে না,—বেশী কথা বলেও না। কাব্যে এরূপ নায়িকা বড়ই মনোহারিণী। কুন্দ,—কবির মানসকন্যা; কাব্যকান-নের প্রেম-পারিজাত;—স্ফুটনোন্মুখ নলিনী। কুন্দের সেই "না" নামক পরিচ্ছেদটি বড়ই অপূর্ব্ব-কবিত্বময়। কুন্দের সেই নির্জ্জন পুষ্করিণী-সোপানে বিরলে এই "না" পড়িয়া, লিয়রের সেই 'কর্ডিলিয়ার' কথা মনে পড়ে।

নিছক সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি—বঙ্কিম বাবুর "কপালকুণ্ডলা;" কুন্দ সেই প্রকৃতির বালিকা হইলেও তাহার বহু নিম্নে। পিশাচী হীরা ও পাপিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথের প্রায়শ্চিত্ত,—বিষবৃক্ষে বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। পাপীকে কিরূপে পোড়াইতে হয়,—কিরূপে পাপীর হৃদয়ের অস্থি-পঞ্জর খাক্ করিতে হয়, তাহা বঙ্কিম বিলক্ষণ জানিতেন। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তও ইহার অন্যতম নিদর্শন।

কতকগুলি ইংরেজী গ্রন্থের চরিত্র ও ঘটনাপুঞ্জের সহিত বঙ্কিম বাবুর কোন কোন গ্রন্থের অবিকল মিল আছে। যথা,— স্কটের আইভান্হো-রেবেকার সহিত জগৎসিংহ-আয়েসার,

সেক্সপিয়রের উইন্‌টার্স টেলের "হারমিয়নি"র সহিত রমার সতীত্ব-বিচারের, "রজনী"র সহিত "মিস্ পুয়োর ফ্রিঞ্চের' এবং দেবী-চৌধুরাণীর বজরার দৃশ্যের সহিত "ক্লিও-পেট্রা"র নৌকাবিহারের। খুটীনাটী করিয়া দেখিলে এমন সাদৃশ্য আরও অনেক দেখা যায়। কিন্তু তাহার প্রয়োজনাভাব। আমরা ত বলিয়াছি, বঙ্কিমের উপন্যাসের প্রধান উপকরণ,—ইংরেজী গ্রন্থের ভাব ও চিত্র। যাই হোক্, ইহাতে কিছু যায় আসে না। বাঙ্গালা কাব্যে এই সব ভাব, চিত্র বা ঘটনা কেমন মানাইয়াছে এবং খাপ খাইয়াছে,—অধিকন্তু তাহা পাঠে কিরূপ আনন্দ ও শিক্ষা হয়, তাহাই আমাদের আলোচ্য। মধুকর পাঁচ ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করিয়াই মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।—সমালোচকের বিচার্য্য, সেই মধুচক্র কেমন এবং তাহার রসপানে প্রাণ শীতল হয় কি না।

দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী বঙ্কিমের প্রথম স্তরের উপন্যাস; তাই এই তিন উপন্যাসের ভাষা এবং লিপিকুশলতা সর্ব্বত্র উৎকৃষ্ট নয়,—বরং দুই এক স্থানে কিছু ত্রুটি আছে।

উপন্যাসে গানের প্রচলন বঙ্কিমই প্রথম করেন। "মৃণালিনী"তে প্রথম গানের প্রচলন হয়। ভিখারিণী গিরিজায়ার সেই গানগুলির রচনা বড়ই মধুর ও কবিত্বপূর্ণ।

মৃণালিনী একটি হিন্দুপত্নী। তবে পতিপ্রাণা সূর্য্যমুখীর, ন্যায় অত উচ্চশ্রেণীর নহে।—স্বামীর পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য হিন্দুপত্নী মৃণালিনী আপনার ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া সঙ্গিনীকে বুঝাইতেছে:—"আমি গুছাইয়া সকল কথা বলিতে পারি নাই, কি বলিতে কি বলিলাম।"

এই "মৃণালিনী" গ্রন্থের "মনোরমা"র চিত্রটি বড় মনোহর।, দুরাকাঙ্ক্ষ-পরায়ণ পশুপতির পার্শ্বে এই পবিত্র পুষ্পটি বড় সুন্দর ফুটিয়াছে। স্বদেশভক্ত বঙ্কিম, চিরদিনই স্বদেশভক্তির পরিচয় দিতেন। সীতারাম ও রাজসিংহের বীরত্বপনা এবং আনন্দমঠের 'সন্তানধর্ম্মের' প্রবর্ত্তনা তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন। অধিকন্তু যে হিসাবে বঙ্গদর্শনে "ভারত-কলঙ্ক", প্রচারে "বাঙ্গালার কলঙ্ক" প্রবন্ধ প্রকটিত হয়, সেই হিসাবে "মৃণালিনী"-গ্রন্থে পশুপতি-চরিত্রের অবতারণা।—"কেবলমাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হইয়াছিল",—স্বদেশভক্ত কবি স্বদেশের এ অখ্যাতি সহিতে না পারিয়া,—বিশ্বাসঘাতক, প্রভুদ্রোহী, দুর্ম্মতিপরায়ণ পশুপতি-চরিত্রের সৃষ্টি করিলেন। আমরাও কৃতার্থ হইলাম। *

স্ত্রীজাতির প্রতি বঙ্কিমের সম্মানের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, সকল উপন্যাসের স্ত্রীচরিত্র অঙ্কনেই বঙ্কিমের কিরূপ কৃতিত্ব। এখন আমরা আমাদের সেই পূর্ব্ব মন্তব্যটি এখানে পুনরুল্লেখ করিতে পারি ;—কবির যেটি প্রাণের জিনিস, কাব্যে সেইটিই অধিক প্রস্ফুটিত হয়। এইজন্যই গীতি-কবিতা-রচয়িতা বড় শীঘ্র ধরা পড়েন। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক মহাকাব্যের কবিও যে, না ধরা পড়েন, এমন নহে,—তবে তাঁহাকে আরও একটু ভাবিয়া ধরিতে হয়। বঙ্কিমের

* বঙ্কিম-ভক্ত গিরিজাপ্রসন্ন তদীয় "বঙ্কিমচন্দ্র" গ্রন্থে এই কথাটি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। এই সব বিষয়ের বিচার-মীমাংসার জন্য চিন্তাশীল অক্ষয় বাবুর নিকট তিনি বিশেষ ঋণী। এই প্রবন্ধলেখকও তাহাতে বাদ যান না।

গদ্যের ভাষাকে আমি "গীতি-কবিতার ছাঁচে ঢালা" বলিয়াছি, সুতরাং সে হিসাবে বঙ্কিমও একজন গীতি-কাব্যকার।—যখন তিনি গীতি-কাব্যকার,—তখন যে প্রতি হাতে তাঁহার ব্যক্তিত্ব বা আত্মবিশেষত্ব প্রকাশ পাইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? বস্তুতঃ বঙ্কিম নারীজাতিকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন।

এই স্ত্রীচরিত্রের উচ্চ আদর্শের বৈচিত্র্যও বঙ্কিম দেখাইয়াছেন। তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা এখানে দিব।

১। "পোড়ারমুখী নয়নতারা প্রফুল্লকে কহিল,—"দিদি, কাল রাত্রে কোথায় শুইয়াছিলি?"

প্রফুল্ল উত্তর দিল,—"ভাই, কেহ তীর্থ করিলে সে কথা আপনমুখে বলে না।"

২। আর এক স্থানে আর এক রকমের স্ত্রী-চরিত্রের মহত্ত্ব দেখুন;—

শান্তির স্বামী জীবানন্দ সন্তানধর্ম্মের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন; শান্তিও কত কষ্টে তাঁহার দেখা পাইয়াছে;—কিন্তু যখন সেই সন্তানধর্ম্মের নেতা, গুরু সত্যানন্দ জীবানন্দের জীবনের উপর অনেক আশা করিয়া তাঁহাকে বাঁচাইতে চাহিলেন এবং শান্তিকে সেজন্য অনুরোধও করিলেন,—তখন শান্তি কঠিন রাক্ষসীর ন্যায় অম্লানবদনে উত্তর দিল,—"আমার ধর্ম্মে আমার যেদিন ইচ্ছা জলাঞ্জলি দিতে পারি,—আমার স্বামীর ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিব? মহারাজ! তোমার কথায় আমার স্বামী মরিতে হয় মরিবেন, আমি বারণ করিব না।"

৩। আর এক স্থান দেখ। শ্রী সীতারামকে উত্তেজিত করিতেছে,—"হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে আর কে রাখিবে?"

৪। আরও এক রকমের একটি দেখ। লবঙ্গলতা তাহার প্রণয়প্রার্থীকে বলিতেছেন—"যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।"

যদৃচ্ছাক্রমে এই কয়েক স্থানমাত্র উদ্ধৃত করিলাম। বঙ্কিমের প্রায় সকল গ্রন্থেই নানা স্থানে এইরূপ রমণী-মহিমা প্রদর্শিত হইয়াছে।

বঙ্কিম নিজেও একস্থানে আবেগভরে তাঁহার আপন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন ;—

"রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী ; রমণী ঈশ্বরের কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া ; পুরুষ দেবতার সৃষ্টিমাত্র। স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়া।" *

যে যাহাকে ভক্তি করে বা ভালবাসে, সে তাহার সবই সুন্দর দেখে। পতিসেবায় বঞ্চিতা শান্তির রূপবর্ণনা করিতে বসিয়া বঙ্কিম কেমন একটি ব্রহ্মচারিণী-মূর্ত্তি আমাদের মানসচক্ষের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়াছেন, দেখুন ঃ—

"আহার নাই—তবু শরীর লাবণ্যময় ; বেশ ভূষা নাই, তবু সে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত। যেমন মেঘমধ্যে বিদ্যুৎ, যেমন মনোমধ্যে প্রতিভা, যেমন জগতের শব্দমধ্যে সঙ্গীত, যেমন মরণের ভিতর সুখ, তেমনি সে রূপরাশিতে অনির্ব্বচনীয় কি ছিল!"

* কৃষ্ণকান্তের উইল।

অদৃষ্টবাদের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া বঙ্কিম প্রায় তাঁহার সকল উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন। অদৃষ্ট ও পুরুষকারের সংগ্রামে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয় প্রদর্শিত করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। শেষ পাপীকে বঙ্কিম যেরূপে পোড়াইতেন, তাহা বঙ্কিমের ন্যায় কবিরই সম্ভবে। কিন্তু এই পাপীর জন্যও তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। একস্থানে তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন;—"দেবতার মেঘ কণ্টকক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টি সংবরণ করে না।"

বলিয়াছি ত, কবি হইতে হইলে অগ্রে সার্ব্বজনীন সুগভীর সহানুভূতি লাভ করা চাই!

বঙ্কিম-সৃষ্ট স্ত্রীচরিত্রের আদর্শের উচ্চতা দেখাইলাম;—এখন পুরুষচরিত্রেরও একটু মহত্ত্ব দেখাইব।—রমানন্দ স্বামী প্রতাপকে বলিতেছেন,—"শুন বৎস! আমি তোমার অন্তঃকরণ বুঝিয়াছি। ব্রহ্মাণ্ড-জয়ও তোমার এই ইন্দ্রিয়-জয়ের তুল্য নহে—তুমি শৈবলিনীকে ভালবাসিতে?"

"সুপ্ত সিংহ যেন জাগিয়া উঠিল। সেই শবাকার প্রতাপ,—বলিষ্ঠ, চঞ্চল, উন্মত্তবৎ হুহুঙ্কার করিয়া উঠিল—বলিল,—"কি বুঝিবে তুমি সন্ন্যাসি! এ জগতে মনুষ্য কে আছে, যে আমার এ ভালবাসা বুঝিবে? কে বুঝিবে, আজি এই ষোড়শ বৎসর আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি! পাপ-চিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি,—আমার এ ভালবাসার নাম—জীবন বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা!"

এরূপ জিতেন্দ্রিয়, সংযমী, পরার্থপর, বীরচরিত্র,—হিন্দুকবি ভিন্ন আর কে আঁকিতে পারে? তাই সমালোচক ও সহৃদয় বঙ্কিম শেষে বলিতেছেন,—"তবে যাও প্রতাপ অনন্তধামে!

* * * লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও, ভালবাসিতে চাহিবে না!"

এই পাপিষ্ঠা-শৈবলিনী-চরিত্রের সহিত টেনিসনের "গুই-নিভার" চরিত্রের কিছু সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখরের অসীম সহিষ্ণুতা ও পরার্থপরতা, শৈবলিনীর প্রতি সেই গভীর প্রচ্ছন্ন প্রেম, কাব্য-সাহিত্যে অতি বিরল। চন্দ্র-শেখরের কিয়দংশ,—বঙ্কিমের "সোণার গাছে মুক্তার ফল" বিশেষ। কাব্যের আদর্শ-হিসাবে, এখানি কপালকুণ্ডলার পরেই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু হায়! এই অপূর্ব্ব কাব্যেরও কিয়দংশ লিখিতে লিখিতে, কবি মনে মনে একটা "উদ্দেশ্য" খাড়া করিলেন।—তাহার ফলেই কাব্যের আদর্শ খাটো হইল, —ইতিবৃত্ত-আখ্যায়িকার "ঝুটা ছাঁচ" বাড়িয়া গেল। তা সে ইতিবৃত্ত-লেখক মুতাক্ষরীণই হউন, আর অন্য কোন মহারথই হউন,—কাব্যের আদর্শের নিকট সে আখ্যায়িকা "ঝুটা ছাঁচ" বৈ আর কি? ইতিহাসের ছাঁচ যতই বড় হউক, তাহা সীমা-বদ্ধ; পরিমিত 'গণ্ডীর' সীমানা ছাড়িয়া তাহার অধিক দূরে যাইবার যো নাই। পরন্তু "কাব্যের আদর্শ",—এ জগৎ ছাড়িয়া ত্রিজগৎ পরিভ্রমণ করিতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সোজা কথাটাও অনেকে বুঝেন না। 'অনেকে' দূরের কথা,—কোন কোন লেখাপড়া-জানা পণ্ডিতও ইহা বুঝিতে না পারিয়া কৈফিয়ৎ চান। পরন্তু দলনী, তকি, মীরকাশিম প্রভৃতিকে গ্রন্থ হইতে একেবারে ছাঁটিয়া ফেলিলে,—মূলে প্রতাপ, শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরের কি কিছু অঙ্গহানি হইত? তাই বলিতে হয়, এমন অপূর্ব্ব কাব্যখানিকে কেন যে

বঙ্কিম ইতিহাসের "ঝুটা ছাঁচে" ঢালিতে গিয়াছিলেন, বুঝিতে পারি না।

তার পর সত্যের অনুরোধে এ কথাও বলিব, চন্দ্রশেখর ও প্রতাপ, এই দুই শ্রেণীর দুই জন পুরুষসিংহেরও দুই এক স্থানে চরিত্র-চিত্রের কিঞ্চিৎ অসঙ্গতি-দোষ ঘটিয়াছে। প্রথম, 'আত্মশোণিত-তুল্য' গ্রন্থদাহের পূর্ব্বে চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীকে উদ্ধারের বা পাপিষ্ঠগণের দমনের বিশেষ চেষ্টা না করা; দ্বিতীয়, শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরের সুখের পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য প্রতাপের প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার পূর্ব্বে প্রতাপের সেই বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী রূপসীকে একবার স্মরণ না করা,—তাহার জন্য অন্ততঃ একবার 'আহা' না বলা। প্রতাপ ও চন্দ্রশেখর,—বঙ্কিমের উৎকৃষ্ট পুরুষচরিত্র হইলেও দুই এক স্থানে এইরূপ একটু আধটু ত্রুটি আছে। আমার বোধ হয়, ইহার প্রধান কারণ এই, উচ্চশ্রেণীর কাব্য-প্রাণ উপন্যাসকে ইতিহাসের গণ্ডীর মধ্যে পূরিতে যাওয়া ঠিক নহে। তাহাতে মূল কাব্যের লক্ষ্য ভুলিয়া ইতিবৃত্তের চৌহদ্দীপূর্ণ ঘটনার মধ্যে কবির "আদর্শ" ঘুরিয়া বেড়ায়।

বঙ্কিমের ছোট গল্প তিনটি;—ইন্দিরা, রাধারাণী ও যুগলাঙ্গুরীয়। "ইন্দিরা" সেই ছোট আকারেই ছিল ভাল।—নূতন সংস্করণে ক্ষুদ্র "ইন্দিরা"কে অযথা পরিবর্দ্ধিত করিয়া, কবি যেন আপনাকে আপনি ব্যঙ্গ করিয়াছেন।—ডাকাতেরা ইন্দিরাকে কালা-দীঘীর ধারে ফেলিয়া গেল, তখন ইন্দিরা আর করে কি?—"হে বাঘ, আমায় খাও; হে সাপ, আমায় কামড়াও"—এই রকম সব "বাঁধা কাহিনী" আওড়াইতে-

আওড়াইতে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তবে ইন্দিরার "সুহাসিনী" চিত্রটি বড় মধুর হইয়াছে। পরন্তু সত্যের অনুরোধে ইহাও আমাদিগকে বলিতে হইবে,—ইহা আমাদের সেই পূর্ব্ব-পরিচিতা—"বিষবৃক্ষের" সেই "কমলমণির" দ্বিতীয় সংস্করণ মাত্র।

স্বদেশভক্ত বঙ্কিম "সীতারাম" চরিত্রে নাটকের বেশ একটি ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছেন। কিন্তু সাধুর অধঃপতনে বড় কষ্ট হয়। সীতারামের অধঃপতনে - তাহার নৈতিক আধ্যাত্মিক অধঃপতনে আমরা কষ্ট অনুভব করিয়াছি। সীতারাম ত ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে,—কবি ইচ্ছা করিলেই ত ইহাকে অন্য ছাঁচে ঢালিতে পারিতেন! আর যদি মুসলমানের জয় দেখানই কবির উদ্দেশ্য হয়, তাহারও ত স্বতন্ত্র পথ ছিল? পক্ষান্তরে সীতারামকে স্বর্গ হইতে নরকে ফেলিয়া, চূড়ান্ত প্রতিঘাত (reaction) দেখাইয়া, শেষে কবি কেন যে তাহাকে অল্পে অল্পে ছাড়িলেন, বুঝিতে পারিলাম না। সীতারামের পাপ কি সাধারণ?—সেই মতিচ্ছন্ন,—সেই লক্ষ্মীস্বরূপা জয়ন্তীকে প্রকাশ্য দরবারে মঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া চাণ্ডালকে অনুমতি করিয়াছিল,—"কাপড় কাড়িয়া নিয়া বেত লাগা।"

এরূপ মহাপাপীকে বঙ্কিমের ন্যায় কবি কেন যে অল্পে অল্পে ছাড়িলেন, বুঝিতে পারিলাম না। তাই বলিয়াছি, শেষ স্তরের উপন্যাসে বঙ্কিমের চরিত্র-চিত্রণ-ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কমিয়া আসিয়াছিল। বলিবে, সীতারামের ত রাজ্যনাশ হইল। কিন্তু রাজ্য ত নাশ হইয়াই ছিল;—সীতারামের মনোরাজ্যের ভিতর কি হইল,—কবির না তাহাই দেখানো দরকার? শেষ কি না—সেই মন্দভাগ্য প্রাণ লইয়া কোথায় পলাইল? কেন,

প্রাণটাই কি এত বড়? সীতারাম মরিল না কেন? আর যদি প্রাণ লইয়া বাঁচিয়াই রহিল, তবে কবি সেই প্রাণে সহস্র বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় যন্ত্রণা,—কি তদপেক্ষাও গুরুতর যন্ত্রণার ব্যবস্থা করিলেন না কেন?—কাব্যাংশে এটি বিশেষ ত্রুটি মনে করি।

নিষ্কাম যোগিনী "জয়ন্তী"র চিত্রটি "সীতারামে" বড় সুন্দর ফুটিয়াছে।

মতিচ্ছন্ন সীতারাম যখন জয়ন্তীকে উদ্দেশ করিয়া চণ্ডালকে অনুমতি করিল—"কাপড় কাড়িয়া নিয়া বেত লাগা।"

তখন, শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ-কারিণী ভক্তিমতী জয়ন্তীর সেই কাতর প্রার্থনা ও তৎসহ নিজ অপরিণামদর্শিতার জন্য অনু-শোচনা,—বড়ই সুন্দর! এ অনুশোচনাটি কিছু প্রচ্ছন্ন। অসাধারণ ঈশ্বর-বিশ্বাসিনী হইলেও, ইতিপূর্ব্বে জয়ন্তীর মনে কিছু ধর্ম্মের অভিমান হইয়াছিল। তাই নাট্যকার বঙ্কিম ঘটনাসূত্রে প্রতিঘাত (reaction) দেখাইবার উদ্দেশ্যে, মতিচ্ছন্ন সীতা-রামের হস্তে জয়ন্তীর সেই অভিমান বা অহঙ্কার চূর্ণ করিলেন। সর্ব্বনিয়ন্তা এইরূপেই ধার্ম্মিককে শিক্ষা দেন। কবি—সেই সর্ব্বনিয়ন্তারই পদানুসরণকারী ক্ষুদ্র শিষ্য। তাই বঙ্কিম এইরূপে সেই নিষ্কামব্রতধারিণী সন্ন্যাসিনীকে শিক্ষা দিলেন। ভ্রমর-চরিত্রের সমালোচনকালে বলিয়াছি, অভিমান—অভিমান; তা' ধর্ম্মেরই হোক আর অধর্ম্মেরই হোক্।—কথাটা এখানে পরিষ্কার হইল।

আর জয়ন্তী?—"জয়ন্তী তখন, অপরিম্লান মুখে, জন-সমারোহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রাজাজ্ঞায় এই মঞ্চের

উপর বিবস্ত্র হইব। তোমাদের মধ্যে যে সতীপুত্র হইবে, সেই আপনার মাতাকে স্মরণ করিয়া ক্ষণকাল জন্য এখন চক্ষু আবৃত করুক—ইত্যাদি।"

এই কথাপ্রসঙ্গে বঙ্কিমের আর একটি গুণের পরিচয় দিব :—"তোমাদের মধ্যে যে "সতী-পুত্র" হইবে"—ঐ "সতী-পুত্র" কথাটি এখানে বসানো বড় চমৎকার কৌশল। ঐ কথাটি ছাড়া আর কোন কথা এখানে খাটে না। ঐ 'সতী-পুত্র' কথাটার মূল্য এখানে কত বল দেখি? যে কথায় হৃদ্‌তন্ত্রীতে আঘাত পড়িবে, সেই না কথা? এখানে এই "সতী-পুত্র" ছাড়া এমন আর কোন কথা আছে কি, যাহা এমনই ভাবে খাপ্ খাইতে পারে?

এমন ওজন করিয়া কথা বসাইতে সকলে বড় পারে না। এই একটি মাত্র কথায় হৃদয় কেমন ব্যক্ত হইয়াছে! এই একটি-মাত্র কথায় কি গুরু-গম্ভীর গর্জ্জন শুনিলাম!

বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাস সম্বন্ধে আর কিছু বিশেষ বলিবার নাই। এইবার "বঙ্কিমী" ভাষা ও "পণ্ডিতী" ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলিব।

১১

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমের লেখনী ধারণ হইতে পরলোক গমনের পরে—আজিও বঙ্কিমের ভাষা লইয়া স্বপক্ষে বিপক্ষে নানা কথা আলোচিত হইয়া থাকে। স্বপক্ষীয়গণের সম্বন্ধে আমরা একমত; বিপক্ষীয়গণের সম্বন্ধে কিছু বলিব।

এই বিপক্ষীয়গণের অধিকাংশ সংস্কৃতাভিমানী; অবশিষ্ট অংশ সংস্কৃতজ্ঞও নহেন,—বাঙ্গলা-ভাষাভিজ্ঞও নহেন;—তথাপি তাঁহারাও বঙ্কিমের ভাষার নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিজেদের কোন মত বা সিদ্ধান্ত নাই;—পণ্ডিতে বলে, 'বঙ্কিম বাঙ্গালা ভাষাটাকে লইয়া যথেচ্ছাচার করিয়াছে', তাই তাঁহারাও সহজে আসর জমাইবার উদ্দেশ্যে, সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া থাকেন। আমরা 'পণ্ডিত'ও নহি, প্রতিধ্বনিকারীও নহি,—আমরা কিন্তু বঙ্কিমের ভাষার একান্ত অনুরাগী ও বড়ই পক্ষপাতী। আমাদের ধারণা এবং বিশ্বাস, বাঙ্গালা ভাষার যে উন্নতি ও পরিপুষ্টি হইতেছে, তাহা বঙ্কিমের স্কুল হইতে। কারণ, বঙ্কিমের স্কুল,—কেবলমাত্র অভিধান ও ব্যাকরণকে সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করেন না,—কাণটাকেও তাহার মধ্যে ধরেন। বস্তুতঃ শ্রুতি-সুখকর, সুমিষ্ট, ভাবপূর্ণ ছোট ছোট কথাগুলি যেমন হৃদয় স্পর্শ করে,—আলোচ্য বিষয়

পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করে,—ব্যাকরণ-সিদ্ধ আভিধানিক বড় বড় কথাগুলি, অনেক স্থলে তেমন করিতে পারে না। সংস্কৃত অলঙ্কার, ধাতু, সন্ধি ও সমাস প্রভৃতির ব্যবহার,—অনেক স্থলে, বাঙ্গালায় দুর্ব্বোধ, জটিল ও কটমট হয়; এবং অনেক স্থলে সেই লেখা 'লেখকের আন্তরিক-ভাব নহে' বলিয়া মনে হইয়া থাকে। বিশেষ, বাঙ্গালায় কতকগুলা কথা এমন ভাবে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে যে, তাহা আর এখন কিছুতেই ব্যাকরণ ও অভিধানের গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত থাকিতে পারে না। যেখানে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে প্রকৃত ভাব বিলুপ্ত হইয়া একটা হাস্যকর প্রহসন হইয়া পড়ে। যেমন 'সতীত্ব', 'নিন্দুক', 'হরিষে বিষাদ' ইত্যাদি অশুদ্ধ কথার শুদ্ধ হইতেছে—সত্ত্ব, নিন্দক, হর্ষে বিষাদ ইত্যাদি। বিশেষ যাঁহারা সরস সাহিত্য ও কাব্য লিখেন,—যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে নানাবিধ নূতন ভাব ও চিন্তার অবতারণ করেন, তাঁহারা কিছুতেই সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অলঙ্কার যথাযথ বজায় রাখিয়া এবং অভিধানকে আদর্শ করিয়া চলিতে পারেন না—কাণ ও প্রাণ এ দু'টাকেও তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতে হয়। কাণে যে কথা সহজে যায়; প্রাণে যে সুর শীঘ্র বাজে,—সেইরূপ কথা ও সুরের প্রতিই এই শ্রেণীর লেখকের ঐকান্তিক লক্ষ্য থাকে। তাহার ফলে, অনেক স্থলে ইঁহারা, জ্ঞাতসারেও ব্যাকরণের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া থাকেন। অপিচ, অজ্ঞাতসারে যাহা হয়, তাহার ত কথাই নাই। পরন্তু ইঁহাদের মনে একটা ধ্রুববিশ্বাস আছে যে, প্রকৃত কবিত্ব-শক্তির উন্মেষণে,—ভাব ও ভাষার অদ্ভুত সমন্বয়ে, ব্যাকরণ আপনা হইতেই লেখার অনুসরণ করিবে।—ইহাই স্বাভাবিক। ইহার

জন্য বিশেষ মাথা ঘামাইবার আবশ্যক করে না। সকল দেশেই এইরূপ হইয়া থাকে। বাঙ্গালারও তবে না হইবে কেন? বিশেষ, বাঙ্গালা ভাষার এখনও শিশুকাল। এখন প্রতিভাবান্ কবি ও চিন্তাশীল লেখকবৃন্দ যেরূপ প্রণালীতে ভাব ও চিন্তা লিপিবদ্ধ করিবেন, ভবিষ্য বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহাই ভাষার ও লেখার আদর্শ হইবে। বৈয়াকরণ তখন বাধ্য হইয়া, সেই ভাষার ও রচনার অনুসরণ করিয়া নূতন ব্যাকরণ প্রস্তুত করিবেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, এখনও ত বাঙ্গালার কোন ব্যাকরণ হয় নাই? তবে এখন এটি শিষ্ট প্রয়োগ, ওটি দুষ্ট প্রয়োগ; এটি ব্যাকরণ-সিদ্ধ, ওটি ব্যাকরণ-অশুদ্ধ;—'পর্য্যাটক' লেখাই সমীচীন,—'পর্য্যটক' লেখা ঠিক নহে,—এই সকল খুটীনাটী লইয়া বিবাদ করায় লাভ কি?

বিশেষ, কোন দেশের কোন অভ্যুত্থানশীল কবিই—কখনও সম্পূর্ণরূপে ব্যাকরণ মানিয়া চলিতে পারেন নাই। সেক্সপিয়র কাব্য লিখিলেন; ব্যাকরণকার সেক্সপিয়রকে আদর্শ করিয়া "সেক্সপেরিয়ান্ গ্রামার" রচনা করিলেন। না করিয়া করেন কি? ব্যাকরণ-সিদ্ধ নয় বলিয়া কি, অমন অপূর্ব্ব কাব্যাবলী ইংরেজ-সমাজ পরিত্যাগ করিবেন?

তবেই বুঝা গেল, প্রতিভাবান্ কবি, যে ভাষায় যেরূপ প্রণালীতে গ্রন্থ লিখিবেন, কবির ভক্তবৃন্দও সেই ভাষার এবং সেই প্রণালীরই অনুসরণ করিবেন। ইহা স্বাভাবিক। সহস্র চেষ্টাতেও বৈয়াকরণ তাহার প্রতিরোধ করিতে পারিবেন না। —সহস্র নিন্দাবাদ এবং গালাগালি করিলেও, কবি বৈয়াকরণের কথা শুনিবেন না।

বঙ্কিম প্রতিভাবান্ কবি; তাই তিনি ভাব ও চিন্তার আদর্শে ভাষা গঠিত করিয়াছিলেন,—ভাষার আদর্শে ভাব বা চিন্তা ব্যক্ত করেন নাই। কেবল কাণে মিষ্ট লাগিবার জন্যই যে, তিনি স্থানবিশেষে ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চলিতেন, তাহা নহে। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে ভাব সহজে ও শীঘ্র লোকের হৃদয় আকর্ষণ করে,—যেটি একটি জীবন্ত মূর্ত্তির মত পাঠকের চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত হয়, সেই ভাষাই অধিক ফলদায়িকা। এই জন্য সাধু শুদ্ধ সংস্কৃতমূলক ভাষা অপেক্ষা,—চলিত অথচ কবিত্বময়ী বাঙ্গালা ভাষার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন এবং কাব্যে তাহার প্রাধান্যও দিতেন। *

* রাজকীয় কর্ম্মোপলক্ষে বঙ্কিম বাবু যখন বহরমপুরে অবস্থিত, তখন একদিন অপরাহ্নে তিনি আর দুই চারিটি বন্ধুর সহিত পথে বেড়াইতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। বঙ্কিম বাবু পথি-পার্শ্বস্থ কতকগুলি দোকান দেখিয়া বলিলেন, "আচ্ছা এ দোকানঘরগুলি লইয়া ভাষার একটা নমুনা দেওয়া যাক।" একজন বলিলেন ওগুলি বেণের দোকান;—এখন আপনি বর্ণনা করুন।" বঙ্কিম বাবু এতটুকুও ইতস্ততঃ না করিয়া উত্তর দিলেন,—"সারি সারি বেণের দোকান।" বলা বাহুল্য, কোন সংস্কৃতাভিমানী বৈয়াকরণ বা অধ্যাপক পণ্ডিত কখনই এত সহজ সাদা কথায় দোকান বর্ণনা করিতেন না। তিনি অন্ততঃ "বিপণী-শ্রেণী" কথাটাও তাঁহার লম্বা বর্ণনার মধ্যে রাখিতেন। বস্তুতঃ, বঙ্কিম ভাবপ্রকাশের অনুযায়ী ভাষা প্রস্তুত করিতেন। সকল স্থলেই যে এত সহজ বাঙ্গালা তিনি লিখিতেন, তাহা নহে,—আবশ্যক হইলে স্থলবিশেষে খুব শুদ্ধ সাধু ভাষা এবং বড় বড় সংস্কৃতকমূল কথাও তিনি চালাইতেন। প্রমাণ স্বরূপ,—"সীতারাম" গ্রন্থের সেই উড়িষ্যার পথ বর্ণনাটি,—যেখানে জয়ন্তীকে আমরা সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পাই,—সেই স্থানটি উল্লেখযোগ্য।

এক্ষণে আমাদের কথা এই, যদি ভাষা বিষয়ে একমাত্র সংস্কৃতকেই আদর্শ করিতে হয়, তবে আর বাঙ্গালা লেখা কেন?—একেবারে সেই "কাদম্বরী" "নৈষধ" হইতেই ত কাঁচিয়া সুরু করিলে হয়? অবশ্য, স্কুলের ছেলেদের পড়াইবার জন্য,আপাততঃ সংস্কৃতের আদর্শানুযায়ী ব্যাকরণ-শুদ্ধ লেখা যেমন চলিতেছে, চলুক; পরন্তু যখন প্রকৃষ্ট পন্থায় বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রস্তুত হইবে, তখন ছেলেদের মধ্যেও উহা প্রচলনের আবশ্যক হইবে না।

আর, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইলেই কি ভাল বাঙ্গালা লিখিতে পারেন? আমরা ত অনেক স্থলেই ইহার বিপরীত দেখি। বলিতে কি, অধিকাংশ টুলো-পণ্ডিতের বাঙ্গালা ও সংস্কৃত উপাধি-প্রাপ্ত বৈয়াকরণ বা অধ্যাপকের বাঙ্গালা,—বাঙ্গালাই নয়। তাহার অক্ষরগুলা বাঙ্গালা বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা অনুস্বার-বিসর্গহীন সংস্কৃত,—অথবা তাহাও নয়;—সে এক কেমন এক রকমেরই! তার না আছে ছন্দঃ, না আছে সুর, না আছে ভঙ্গি, না আছে লালিত্য। পক্ষান্তরে সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ, —এমন কি সংস্কৃত-বর্ণ-জ্ঞানহীন দুই একজন প্রতিভাবান্ লেখককে এমন উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা লিখিতে দেখা যায় যে, সেরূপ বাঙ্গালা কম বাঙ্গালীতে লিখিতে পারেন!

ইহার একটি কারণ,—উৎকৃষ্ট ইংরেজী সাহিত্য এবং সেই উৎকৃষ্ট ইংরেজী সাহিত্যের আদর্শে বাঙ্গালা গ্রন্থের সমধিক

ফলতঃ বঙ্কিম বাবুর ভাষা যেন কতকটা বিজ্ঞানের উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া লিখিত।—শ্রীযুক্ত স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোন সভায় বঙ্কিম বাবুর ভাষা সম্বন্ধে এই ভাবের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্রচার। আর একটি কারণ,—সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর সহিত বিশেষরূপে মেলা-মেশা। ইহার ফলে কোন কোন শক্তিশালী লেখক সত্য সত্যই অতি উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব খাঁটী বাঙ্গালা লিখিতে সক্ষম হন। সংস্কৃত-ভাষায় এককালে অনভিজ্ঞ হইয়াও ভাষার উপর তাঁহাদের অসাধারণ—অদ্ভুত অধিকার।—কথাটা সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অবশ্যই কাহারও কাহারও ভাল লাগিবে না।—"তাও কি কখন সম্ভবপর হয়? সংস্কৃত না শিখিলে কি কেহ কখন লেখক হইতে পারে?"—এই রকম সব তর্ক ও যুক্তি অবশ্যই তাঁহাদের মনে উদয় হইবে। ইহা সত্ত্বেও সত্যের অনুরোধে বলিব,—কথাটা ঠিক।

আজকাল এই ব্যাকরণের "বাঁধন" লইয়া এক শ্রেণীর সাহিত্য-সেবীর মধ্যে খুব একটা সোরগোল চলিয়াছে। সে কথার খুটীনাটী,—'উতোর' কাটাকাটি,—স্বপক্ষে বিপক্ষে প্রমাণ প্রয়োগ,—সন্ধি—সমাস-তদ্ধিত-প্রত্যয়ের হাঁক-ডাক,—লিঙ্গ-কারক-ধাতুর সমস্যা-ব্যাখ্যা,—মুগ্ধবোধ পাণিনির বিচার—ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় দেখিয়া মনে হয়,—কোন শক্তিশালী ভাষাতত্ত্ববিৎ অথচ নিরপেক্ষ সুপণ্ডিত,—উদার ও উন্নত প্রণালীতে যদি এ সময় একখানি খাঁটী বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন, তবে 'সাহিত্যিক' হাটের অনেক গণ্ডগোল মিটিয়া যায়।

আর এক কথা,—কবিগণ চিরদিনই ব্যাকরণের অগ্রে অগ্রসর হইয়া থাকেন। সহস্র নিষেধ ও বাধা সত্ত্বেও তাঁহারা আপন লক্ষ্য পরিত্যাগ করেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শব্দের মধুরতার সহিত ভাবের পরিস্ফুটতা তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে দেখিয়া থাকেন।

এই মনে করুন, 'পরিষ্কার' শব্দটা বিশেষ্য। অথচ 'পরিষ্কার-কণ্ঠে', 'পরিষ্কার-স্বরে' অনেক কবিই লিখিয়া থাকেন। কারণ, 'পরিষ্কার' বলিতে মনে যে ভাবের উদ্রেক হয়, পরিষ্কৃত' বলিতে ঠিক সে ভাব মনে আসে না। এইরূপ, আজকালের অধিকাংশ কাব্য—লেখক,সম্বোধনে 'ভগবান্','বন্ধু','গুরু' প্রভৃতি পদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। মনে কর, একটি অনাথিনী রমণী রোদন করিয়া বলিতেছে,—"হা ভগবান্! তোমার মনেও এই ছিল!" এখানে রমণীর প্রকৃতির বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কবি সম্বোধনের 'ভগবন্‌কে' 'ভগবানে' পরিণত করিলেন। আর 'সম্বোধনের' সম্মানার্থ,—যদি বন্ধু স্থলে 'বন্ধো', গুরু স্থলে 'গুরো' লিখিত হয়, তাহা হইলে কি তাহা কাণে মিষ্ট শুনায়, না প্রাণে ভাল বাজে? এই দুঃখেই একজন প্রবীণ সুরসিক সমজদার লেখক রহস্যচ্ছলে এই মর্ম্মে বলিয়াছিলেন,—"হে শশি! তুমি শোভাই দাও, আর প্রাণে আনন্দই ঢাল,—আমি তোমায় 'শশিন্' বলিতে পারিব না।" * এইরূপ আরও অনেক কথার অবতারণা করা যায়; কিন্তু তাহার স্থান ইহা নহে।

বুদ্ধিমান্ বঙ্কিম বাঙ্গালীর হৃদয় ও মন বিলক্ষণরূপেই বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি ঠিক সেই হৃদয় ও মনের সুরে সুর মিলাইয়া, অপূর্ব্ব মধুর গীতিকবিতার ছাঁচে বাঙ্গালাভাষা গঠিত করিলেন। তাই তিনি সর্ব্বত্র ব্যাকরণ ও অভিধানের প্রাধান্য দিলেন না, কিংবা সংস্কৃতকেও আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি-

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার-লিখিত "চন্দ্রালোকে" প্রবন্ধ।—বঙ্গদর্শন (উপস্থিত "কমলাকান্তের দপ্তরে উদ্ধৃত।)

লেন না। অপিচ, তিনি যে সুস্পষ্ট অথচ সুললিত বাঙ্গালাভাষা গঠিত করিলেন, তাহা প্রাণময়ী ও মর্ম্মস্পর্শিনী। ইংরেজীতে যাহাকে 'life' বলে,বঙ্কিমের ভাষায় সেইরূপ একটা 'life'দেখিতে পাই। কখন বীণার ঝঙ্কার, কখন পাখোয়াজের গুরুগম্ভীর রব, কখন বা ধূর্জ্জটির ডম্বুরের ধ্বনি,—আ মরি মরি! সে ভাষার কি আর তুলনা আছে? যখন যেমনই হইতে পারে, হওয়া উচিত, বা হওয়া স্বাভাবিক,—ঠিক যেন প্রাণের তারে সুর মিলিয়া যথাক্রমে সা, রি, গা, মা রূপে কাণের কাছে বাজিতে থাকে! যেন কৃষ্ণের মুরলীরবে যমুনার জল—কল্ কল্ ছল্ ছল্ করিয়া—নাচিয়া নাচিয়া—ভাবতরঙ্গে লহরীলীলা তুলিতে থাকে! যে কোন স্থান উদ্ধৃত করিয়া ইহা প্রতিপন্ন করা যায়;—

"কমলাকান্ত অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী—তাহার জন্য এত বন্ধন কেন? এ দেহ পচিয়া উঠিল, ছাইভস্ম মনের বাঁধনগুলা পচে না কেন? ঘর পুড়িয়া গেল—আগুন নেবে না কেন? পুকুর শুকাইয়া আসিল—এ পঙ্কে পঙ্কজ ফুটে কেন? ঝড় থামিয়াছে—দরিয়ায় তুফান কেন? ফুল শুকাইয়াছে—এখনও গন্ধ কেন? সুখ গিয়াছে—আশা কেন? স্মৃতি কেন? যত্ন কেন? প্রাণ গিয়াছে—পিণ্ডদান কেন? * * * বাঁশী ফাটিয়াছে—আবার ঋ, গ, ম, কেন? প্রাণ গিয়াছে, ভাই, আর নিশ্বাস কেন? সুখ গিয়াছে, ভাই, আর কান্না কেন?

"তবু কাঁদি। জন্মিবামাত্র কাঁদিয়াছিলাম, কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না।" *

* কমলাকান্তের দপ্তর। (কমলাকান্তের এ কান্না,—এক হিসাবে কবিরই প্রাণের প্রতিধ্বনি। সেই "চন্দ্রমাশালিনী, যা মধুযামিনী, না মিটল

এমন প্রাণময়ী, মর্ম্মস্পর্শিনী করুণভাষা ও অপূর্ব্ব গানের সুর বাঙ্গালীর সাহিত্য-ভাণ্ডারে যিনি দিয়াছেন, তিনিই ধন্য। আজ তাঁহার প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া আমিও ধন্য হইলাম।

আশা রে!"—সেই মর্ম্মস্পর্শী গানটির সহিত—সংসার-বিরাগী কমলাকান্তের এই মর্ম্মকথাগুলি মিলাইয়া দেখ,—বুঝিবে, সেই একই সারি-গান,—সেই একই প্রাণের ক্রন্দন।—সত্যই, এ সংসারে কবি কাঁদিতেই আসেন।)

১২

আদর্শমূলক উপন্যাসে (idealistic novels) কবি যেমন সুকৃতি অর্জ্জন করিতে পারেন, ঘটনামূলক উপন্যাসে (realistic novels) কিম্বা স্থূলঘটনামূলক গল্পে (tales) কবির সেরূপ উচ্চপদ পাইবার আশা নাই। কারণ, আদর্শ অনন্ত; ঘটনা সান্ত। "কাব্যের আদর্শ" আলোচনার সময়ে আমরা এ কথা বলিয়াছি। অপিচ, ঘটনামূলক ইতিবৃত্ত অপেক্ষা প্রকৃত কাব্যগ্রন্থ মানুষের অধিক উপকারী। ইউরোপীয়দিগের মত, হিন্দুর ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, এমন নহে;—কিন্তু হিন্দুর হৃদয়ের ইতিহাস—রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি যদি না থাকিত, তাহা হইলে যে, কি ক্ষতি হইত, তাহা হিন্দুই বুঝিত।

সৌভাগ্যবশতঃ, আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শ-মূলক উপন্যাসের প্রবর্ত্তক, গুরু ও শিক্ষাদাতা।

এইবার সমালোচক বঙ্কিমের আর একটু পরিচয় আমরা দিব।

বঙ্কিমের 'উত্তরচরিতের' সমালোচনাটি অতি অপূর্ব্ব। সীতার প্রতি রামের প্রেমের গভীরতা বুঝাইবার জন্য সমালোচক বঙ্কিম বলিতেছেন,—

"স্ত্রীবিসর্জ্জন মাত্রই ক্লেশকর—মর্ম্মভেদী। যে কেহ

আপন স্ত্রীকে বিসর্জ্জন করে, তাহারই হৃদয়োদ্ভেদ হয়। যে বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবন-সুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসার-সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, বার্দ্ধক্যে যে জীবনাবলম্বন—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে? গৃহে যে দাসী, শয়নে যে অপ্সরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্য্যে যে মন্ত্রী, ব্যসনে যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্ম্মে যে গুরু,—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা, স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে ঔষধ, অর্জ্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশঃ, বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা,—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আর যে ভালবাসে? পত্নী-বিসর্জ্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা! আবার যে রামের মত ভালবাসে,—তাহার কি কষ্ট, কি জীবনসর্ব্বস্ব-ধ্বংসাধিক যন্ত্রণা!"

অন্যত্র,—ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে বঙ্কিমের ধারণা এইরূপ ঃ

"ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পূরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর,—হিন্দুর হৃদয়-পিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ। স্বামী আরও পরিষ্কাররূপে সান্ত। এই জন্য প্রেম পবিত্র হইলে, স্বামী, ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা। অন্য সব সমাজ হিন্দুসমাজের কাছে, এ অংশে নিকৃষ্ট। ঈশ্বর-ভক্তির প্রথম সোপান পতিভক্তি।"*

* দেবীচৌধুরাণী।

প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রতি বঙ্কিমের ধারণা কিরূপ, দেখুন। "ধর্ম্মতত্ত্বে" গুরু-শিষ্যের কথোপকথন উপলক্ষে, সমালোচনচ্ছলে বঙ্কিম লিখিতেছেন ;—

"হিন্দুধর্ম্মে ব্রাহ্মণগণ সকলের পূজ্য। তাঁহারা যে বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং আপামর সাধারণের বিশেষ ভক্তির পাত্র, তাহার প্রধান কারণ এই যে, ব্রাহ্মণেরাই ভারতবর্ষের সামাজিক শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মবেত্তা, তাঁহারাই বিজ্ঞানবেত্তা, তাঁহারাই পুরাণবেত্তা, তাঁহারাই দার্শনিক, তাঁহারাই সাহিত্যপ্রণেতা, তাঁহারাই কবি। তাই অনন্ত জ্ঞানী হিন্দুধর্ম্মের উপদেশকগণ তাঁহাদিগকে লোকের অশেষ ভক্তির পাত্র বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন। সমাজ ব্রাহ্মণকে এত ভক্তি করিত বলিয়াই, ভারতবর্ষ অল্পকালে এত উন্নত হইয়াছিল। সমাজ শিক্ষাদাতাদিগের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী হইয়াছিল বলিয়াই সহজে উন্নতিলাভ করিয়াছিল।

"দেখ, বিধি বিধান ব্যবস্থা—সকলই ব্রাহ্মণের হাতে ছিল। নিজহস্তে সে শক্তি থাকিতেও তাঁহারা আপনাদের উপজীবিকা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?—তাঁহারা রাজ্যের অধিকারী হইবেন না, বাণিজ্যের অধিকারী হইবেন না, কৃষিকার্য্যের পর্য্যন্ত অধিকারী নহেন। এক ভিন্ন কোন প্রকার উপজীবিকার অধিকারী নহেন। যে একটী উপজীবিকা ব্রাহ্মণেরা বাছিয়া বাছিয়া আপনাদিগের জন্য রাখিলেন, সেটি কি? যাহার পর দুঃখের উপজীবিকা আর নাই; যাহার পর দারিদ্র্য আর কিছুতেই নাই—ভিক্ষা। এমন নিঃস্বার্থ উন্নতচিত্ত মনুষ্যশ্রেণী ভূমণ্ডলে আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই।

তাঁহারা বাহাদুরীর জন্য বা পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য বাছিয়া বাছিয়া ভিক্ষা-বৃত্তিটি উপজীবিকা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ঐশ্বর্য্য সম্পদে মন গেলে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে, সমাজের শিক্ষাদানে বিঘ্ন ঘটে, এক মন এক ধ্যান হইয়া লোকশিক্ষা দিবেন বলিয়াই, সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। যথার্থ নিষ্কামধর্ম্ম যাহাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারাই পরহিতব্রত সঙ্কল্প করিয়া এরূপ সর্ব্বত্যাগী হইতে পারে। তাঁহারা যে আপনাদিগের প্রতি লোকের অচলা ভক্তি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাও স্বার্থের জন্য নহে। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, সমাজের শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি ভিন্ন উন্নতি নাই, সেজন্য ব্রাহ্মণ-ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। এই সকল করিয়া তাঁহারা যে সমাজ ও সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আজিও জগতে অতুল্য; ইউরোপ আজিও তাহা আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে। ইউরোপে আজিও যুদ্ধটা সামাজিক-প্রয়োজন-মধ্যে। কেবল ব্রাহ্মণেরাই এই ভয়ঙ্কর দুঃখ—সকল দুঃখের উপর শ্রেষ্ঠ দুঃখ—সকল সামাজিক উৎপাতের উপর বড় উৎপাত—সমাজ হইতে উঠাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। সমাজ ব্রাহ্মণ্য-নীতি অবলম্বন করিলে যুদ্ধের আর প্রয়োজন থাকে না। তাঁহাদের কীর্ত্তি অক্ষয়। পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদিগের মত প্রতিভাশালী, ক্ষমতাশালী, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক কোন জাতিই নহে। প্রাচীন এথেন্স বা রোম, মধ্যকালের ইতালী, আধুনিক জর্ম্মণি বা ইংলণ্ডবাসী—কেহই তেমন প্রতিভাশালী বা ক্ষমতাশালী ছিলেন না। রোমক ধর্ম্মসমাজ, বৌদ্ধ ভিক্ষু

বা অপর কোন সম্প্রদায়ের লোক তেমন জ্ঞানী বা ধার্ম্মিক ছিলেন না।"

বঙ্কিমের এই "ধর্ম্মতত্ত্ব" বা "অনুশীলনের" ন্যায় বহু গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ বাঙ্গালায় আর দুই চারিখানি মাত্র আছে। অনুশীলনের পত্রে পত্রে—ছত্রে ছত্রে—মণি-মাণিক্য জ্বলিতেছে। তবে ইহা বিদেশীয় ধর্ম্মমতের গুরুভারে প্রপীড়িত। এখন মনে হয়, ইহার অনেক স্থানে অনেকরূপ অসামঞ্জস্য এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিও আছে। *

"কৃষ্ণচরিত্রে" বঙ্কিম যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু অতি দুঃখের বিষয়, ঐ গ্রন্থের মেরুদণ্ড (মূল ভক্তিবাদ) ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, গ্রন্থখানি প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত ভাবুকের নিকট মূল্যবান্ হইবে না। তা ছাড়া, যেটি মনের

* একবার ধর্ম্মতত্ত্বের 'মানবপ্রীতি'র কথা উল্লেখ করিয়া বঙ্কিম বাবুকে বলিয়াছিলাম, "উটি আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না,—অঙ্কশাস্ত্রের মত ভাগাভাগি করিয়া প্রীতি বা প্রেম হৃদয়ে পোষণ করা যায় না।" কথাটা শুনিয়া বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "বুঝিয়াছি, তুমি যে দিক্ হইতে ধরিয়াছ। হাঁ, কথাটা কিছু অস্পষ্ট হইয়াছে বটে। তা পরবর্ত্তী সংস্করণে কথাটা খোলসা করিয়া দিব।"

এ হিসাবে পূজনীয় শ্রীম-লিখিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত"—অথবা সেই পুরুষোত্তমের অমূল্য উপদেশ—ধর্ম্মসাহিত্যে অতুলনীয় এমন সার্ব্বজনীন উদার মত ও অপূর্ব্ব সরল ধর্ম্মব্যাখ্যা এ জীবনে আর দেখি নাই। এ অমৃতপানে জীব অমর হইবে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউন, এই অপূর্ব্ব কথামৃত পাঠ করুন,—ত্রিতাপজ্বালা বিদূরিত হইবে। ইহকাল-পরকাল উভয়কালের পথ পরিষ্কার হইবে। সকল সংশয়, সকল মনোবাদ ঘুচিয়া যাইবে। মানুষ নবজীবন লাভ করিবে।

মত হইয়াছে, লেখক সেইটিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন; যেটি মনে ধরে নাই, সেটি "প্রক্ষিপ্ত" বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। সুতরাং "কৃষ্ণচরিত্রের" সকল স্থলে আমরা একমত হইতে পারি নাই। বিশেষ যিনি ভগবান্, (যদি সত্য সত্যই সে বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে) তাঁহার সম্বন্ধে অমন ভাবে সমালোচনা চলে না।

"প্রচারে" প্রকাশিত বঙ্কিম বাবুর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয় নাই। সেই অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যারও সকল স্থলে আমরা একমত হইতে পারি নাই।

ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বহু বিষয়ে বঙ্কিম বাবুর সহিত আমাদের মত-বিরোধ আছে।

"সাম্য" বঙ্কিমের প্রথম অবস্থার লেখা; ইদানীং তাঁহার সে মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাই তিনি নিজে তাহা আর পুনর্মুদ্রিত করেন নাই। মত পরিবর্ত্তনে বঙ্কিম অপমান বোধ করিতেন না। "কৃষ্ণ-চরিত্রের" নূতন সংস্করণের ভূমিকায় অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহা তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এক "কবিতা-পুস্তক" ও চুট্‌কি গল্পগুলি এবং দুই চারিটা প্রবন্ধ ও "রহস্য" বাদে, আর সকল গ্রন্থ এত উৎকৃষ্ট ও উচ্চ-শ্রেণীর যে, বঙ্কিম ভিন্ন ঠিক ওরূপ ভাবে—ভাব ও ভাষার আশ্চর্য্য সমন্বয় করিয়া,—আর কেহ উহা লিখিতে পারে না। বঙ্কিম অপেক্ষা পণ্ডিত অনেকে থাকিতে পারেন,—বঙ্কিম অপেক্ষা পড়াশুনাও কাহারও কাহারও অধিক থাকিতে পারে; কিন্তু ঠিক বঙ্কিমের হৃদয় লইয়া লেখনী ধারণ করিবার সৌভাগ্য, ভিক্টোরিয়া-যুগে, বোধ করি, কোন বাঙ্গালী লেখকের হয় নাই।

বঙ্কিমের অবর্ত্তমানে, এখন যিনি যাহা করিতেছেন, তাহা সেই, বঙ্কিমেরই আরব্ধ কার্য্যের উপসংহার মাত্র। তবে এ স্রোতেরও অবসান হইবে। বিধাতার বিধানে, যথাদিনে, নূতন যুগও প্রবর্ত্তিত হইবে।

বঙ্কিমের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্যের অবস্থা তুলনা করিয়া কবি রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন,—"দার্জ্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয় রবিরশ্মি-সমুজ্জ্বল তুষারমুকুটিত মস্তক চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধ গিরিপারিষদ্-বর্গের কত ঊর্দ্ধে সমুত্থিত রহিয়াছে।"

বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমের স্থান কোথায়,—সহৃদয় পাঠকই এখন তাহার বিচার করুন।

আর কেবলমাত্র উপন্যাসের দিক্ হইতে দেখিলে এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি,—কি ভাব, কি ভাষা, কি বর্ণনা, কি চরিত্র-চিত্র, কি রচনা-নৈপুণ্য, কি লিপি-কুশলতা, কি উদ্ভাবনী শক্তি, কি সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, কি ঘটনা-সামঞ্জস্য, কি নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাত,—সকল বিষয়েই আমাদের বঙ্কিম,—উপন্যাস-জগতে রাজরাজেশ্বর!

১৩

এইবার বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-ধর্ম্ম ও গ্রন্থসমূহের ফলাফল সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া আমরা বিদায়গ্রহণ করিব।

সাহিত্য-ধর্ম্মে বঙ্কিমের আন্তরিক অনুরাগ ছিল। প্রাণের পিপাসায় তিনি সাহিত্যধর্ম্মের সেবা করিতেন। তাহাতে কৃত্রিমতা ও কপটতার লেশমাত্রও ছিল না। তিনি যখনই কিছু সত্য, সুন্দর ও সার বুঝিতেন,—মুক্তকণ্ঠে নির্ভীকচিত্তে তাহা পরিব্যক্ত করিতেন। সাধারণ-মতকে পদতলে রাখিয়া, সর্ব্ব সময়েই তিনি সকলের এক সোপান উচ্চে অবস্থিতি করিতেন। মধ্যবয়সে তিনি পাঠকের মনোরঞ্জনের দিকে একটু লক্ষ্য করিয়াছিলেন বটে. কিন্তু সময়ে তিনি এ ত্রুটির হাত এড়াইয়াছিলেন। তখন আর স্তুতি-নিন্দা তাঁহাকে টলাইতে পারিত না। তাঁহার কথাই ছিল এই, 'পাবলিক্ মতের উপর কখন আত্মনির্ভর করিতে নাই।' কথা-প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধ-লেখককেও তিনি এক দিন উপদেশ দিয়াছিলেন,— "যদি এ জগতে কিছু করিতে চাও, তবে কিছুতেই পাবলিকের পানে তাকাইবে না। পাবলিকের পানে তাকাইলে পাবলিক-কেও সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না,—জগতেরও কিছু করিতে পারিবে না!"

কেহ কেহ বলেন,—"কবির জীবনে আবার বিশেষ কার্য্য কি ? কবি-হৃদয়ে প্রতিভা অবশ্য আছে বটে, কিন্তু তাহাতে প্রেমের অভাব। প্রতিভা নিষ্ক্রিয়, প্রেম কার্য্যশীল।" কিন্তু কথাটা কি ঠিক ? প্রতিভা ও প্রেম কি স্বতন্ত্র বস্তু ? আর বলি-স্বতন্ত্র বস্তু হইলেও কি দু'য়ে খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই ? বিরুদ্ধবাদী বেন, 'প্রতিভা বড়জোর কাগজে-কলমে একটা কোন-কিছুর উৎকৃষ্ট চিত্র আঁকিতে পারে, প্রেম কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট নহে,—প্রেম সেই কোন-কিছুর একটা কাজ না করিয়া নিরস্ত হয় না।' কথাটা অত সূক্ষ্মভাবে (abstract form-এ) না বলিয়া, একটা ঘটনা উপলক্ষ করিয়া স্থূলভাবে (concrete form-এ) বুঝা যাক্।

মনে কর, কোন এক অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে।—প্রতিভাবান্ কবি বড়-জোর তখন সেই দুর্ভিক্ষের একখানি নিখুঁৎ 'ফটো' তুলিয়া জন-সাধারণের চক্ষে ধরিলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রেমিক তাহাতে স্থির থাকিতে পারিলেন না,—তিনি তখনই প্রাণের টানে সেই দুর্ভিক্ষ-স্থলে উপস্থিত হইয়া, আপন অবস্থা-নুযায়ী সেই বুভুক্ষু নর-নারীগণকে এক এক মুষ্টি অন্নদান করিয়া যথার্থ মনুষ্যোচিত কার্য্য করিলেন।—বিরুদ্ধবাদী বোধ হয়, এইবার বড়-গলা করিয়া বলিতে পারিবেন,—"এখন এই দু'য়ের মধ্যে প্রকৃত কাজ করিল কে ?"

ঠিক এই কথা লইয়া একদিন আমার সহিত একজন প্রতিভাবান্ কবির কথোপকথন হয়। * অবশ্য, আমরা দুই

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত একদিন তাঁহার নিভৃত রচনাগারে বসিয়া এই কথাটি হইয়াছিল।

জনেই এক-মতাবলম্বী ছিলাম। কবি-ভ্রাতা বলিলেন, "দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে প্রেমিকের প্রেমাশ্রু ও কার্য্যতৎপরতা যে অতীব প্রশংসনীয়, তাহার আর কথা কি? কিন্তু প্রকৃত প্রতিভাবান্ কবিও যদি সেই সময়োচিত একটি অতি স্বাভাবিক-চিত্র তাঁহার কোমল কবিত্ব-তুলিকায় অঙ্কিত করিতে পারেন, তাহাও বড় কম প্রশংসার কথা নহে। কারণ, প্রেমিকের প্রেমাশ্রু বা কার্য্যতৎপরতা তাঁহার ব্যক্তিগত নিজস্ব; কিন্তু প্রতিভাবান্ কবির অশ্রু তাঁহার একার সম্পত্তি নহে,—সমগ্র দেশ, সমগ্র সমাজ, সমগ্র পৃথিবী সেই অশ্রুর দাবী করিতে পারে। কারণ, দেশস্থ যাবতীয় নর-নারীর উত্তপ্ত অশ্রু লইয়া সেই চিত্রখানি অঙ্কিত।"

কথাটার বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখি না। তবে এ কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি, সেই প্রেমিকের প্রেমাশ্রু ও কার্য্যতৎপরতার পরিতৃপ্তি, তাঁহার আত্মজীবনেই সমাহিত হইতে পারে,—বড়-জোর তাঁহার বংশপরম্পরা ঐ কীর্ত্তির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারেন;—কিন্তু প্রতিভাবান্ কবির সেই মর্ম্মোদ্ঘাটিত, সদ্য-অশ্রু-বিকশিত দুর্ভিক্ষের চিত্রখানি সভ্য মনুষ্য-সমাজ যুগ যুগ ধরিয়া নির্নিমেষ নয়নে দেখিতে থাকিবে।

অতএব প্রতিভাও যে নিষ্ক্রিয় নহে, তাহা আমরা সংক্ষেপে একরূপ প্রতিপন্ন করিলাম।

"যে খাটে সেও যেমন কাজ করে, আর যে ভাবে সেও একরূপে কাজ করে"—এই সোজা কথাটাও, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও কেহ কেহ স্বীকার করিতে নারাজ।

কেননা, কোন কোন সামাজিকের মুখে সময়ে সময়ে শুনিতে পাই, বঙ্কিমকর্ত্তৃক দেশের কোন উপকার হওয়া দূরে থাক্,—ঘোর অনিষ্ট হইয়াছে। হিঁদুর ছেলে-মেয়েরা নাকি তৎপ্রণীত উপন্যাসাবলীর নায়ক-নায়িকার চিত্র দেখিয়া উচ্ছৃঙ্খল, আচার-ভ্রষ্ট, এবং আরও কি হইতেছে। তা ছাড়া, ধর্ম্ম ও সমাজ-সম্বন্ধীয় কথার আলোচনা করিয়া বঙ্কিম হিন্দুর মর্ম্মে আঘাত দিয়াছেন।—তবে আর তিনি দেশের কি কাজ করিলেন? তাঁকে লইয়া তোমরা অত হৈ চৈ কর কেন?

কথাটার উত্তর ইতিপূর্ব্বে একবার একটু দিয়াছি, আবার একটু দিই।—কথাটা বিজ্ঞের মুখে বলিতে ও শুনিতে বেশ। কিন্তু এ শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞগণ কি বঙ্কিমকে একটু সরল দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন? প্রতিভার কার্য্য কি, কবির আদর্শ কি, তাহা কি তাঁহারা ভ্রমেও কিছু ভাবিয়া দেখিয়াছেন? পূর্ব্বেই আমরা একস্থলে কবির আদর্শের সহিত রামধনুর তুলনা করিয়াছি, এবং ইহাও বলিয়াছি, কেবলমাত্র বর্ত্তমান লইয়া কবি জন্মগ্রহণ করেন না,—সুদূর ভবিষ্যতের প্রতিও তাঁহার লক্ষ্য থাকে, এবং সেই লক্ষ্য-সাধনোদ্দেশ্যে, ইহ-জীবনে তিনি অশ্রান্ত শ্রম ও কঠোর কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় প্রদান করেন।—প্রকৃত প্রতিভাবানের কার্য্যই এই।

এই সব সত্ত্বেও কিছু না দেখিয়া, না বুঝিয়া, না ভাবিয়া, খামকা যাঁহারা বঙ্কিমের প্রতি দোষারোপ করেন, তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বা কৃপাপাত্র ভিন্ন আমরা আর কি বিবেচনা করিতে পারি? তোমার হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতার জন্য, কি তোমার সমাজের নৈতিক দুর্ব্বলতার জন্য, অথবা প্রকৃত শিক্ষা, দৃষ্টান্ত ও উপদেশ অভাবে তোমার

ছেলেমেয়ে উৎসন্ন যাইতেছে বলিয়া, কবি ত তাঁহার আদর্শকে খাটো করিতে পারেন না? জীবনে যে উচ্চ আদর্শ লইয়া তিনি ধরাবক্ষে বিচরণ করেন,—ধর্ম্মে বা সমাজে অথবা সাহিত্যে,—যখনই তিনি তাহার কোনরূপ ব্যতিক্রম দেখিতে পান, তখনই অমনি সিংহবিক্রমে, কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, সেই প্রতিভাবান্ পুরুষসিংহ আত্ম-প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখেন। মহামহিমময়ী, মহাতেজস্বিনী এই প্রতিভার নাম যদি অহঙ্কার হয়, তবে এ অহঙ্কারকে, অবস্থা-বিশেষে, পূজা করিতেও আমরা প্রস্তুত। মহামনস্বী কার্লাইল এই প্রতিভাপূজার ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাঁহার "Hero-Worship" নামক অপূর্ব্বগ্রন্থে "বীর-কবির" পূজার বিধি আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, প্রকৃত প্রতিভাবান্ কবিও একজন মহা বীরপুরুষ।

তবে বলিবে, বঙ্কিম আর "হাতে কলমে" দেশের কি করিয়া গিয়াছেন? উত্তরে আমরা বলি, একজন philosopher (দার্শনিক) সারাটা জীবন ঘরে দ্বার দিয়া বসিয়া থাকিয়া, দর্শন-তত্ত্বের একটা কূটমীমাংসা স্থির করিয়া, একরূপ ভাবিতে ভাবিতেই মরিয়া গেল,—আর একজন পাহাড়ী-কুলি বিপুল পরিশ্রমে পাহাড় কাটিয়া রেলপথ বসাইল;—এ দু'য়ের মধ্যেই বা কে হাতে-কলমে দেশকে অধিক কৃতজ্ঞ করিয়া গেল,—ভাল তুমিই বল?

তাই বলিতেছিলাম, 'কর্ম্মযোগী বঙ্কিম' আজীবন উৎকট পরিশ্রমে সাহিত্য-ধর্ম্মের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই ঐকান্তিক অনুরাগ ও অদ্ভুত অনুশীলনের ফল,—উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের সহিত ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়। যেন হরি-হর মিলন!

ইতিপূর্ব্বে, আর কাহারও দ্বারা নব্য বঙ্গসাহিত্যের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্তর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তিনি 'প্রচারে' স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন,—"বিশ্বেশ্বরের এই বিশ্বসৃষ্টির অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার কোন্ সাহিত্যে কথিত হইয়াছে? একটী তৃণে বা একটী মাছির পাখায় যত আশ্চর্য্য কৌশল আছে, কোন্ উপন্যাস-লেখকের কথায় তত কৌশল আছে?"

বস্তুতঃ, বঙ্কিমের এই সাহিত্য-সেবা,—তাঁহার প্রতিভাময় ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম ও প্রধান অনুষ্ঠান। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ, তদ্বিরচিত গ্রন্থাবলীও সেই মহালোকে আলোকিত।